Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
কুরআন ও বিজ্ঞান (সৃষ্টির রহস্য, মানব শরীরবৃত্তীয়, জীবনাচরণ ও ধর্মীয় বিধি পালন -এ কুরআনিক বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

কামরুন নাহার

রোলঃ ২১৫০০১৩৮১

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও বিজ্ঞান (সৃষ্টির রহস্য, মানব শরীরবৃত্তীয়, জীবনাচরণ ও ধর্মীয় বিধি পালন -এ কুরআনিক বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা)

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

কামরুন নাহার

রোলঃ ২১৫০০১৩৮১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন ও বিজ্ঞান (সৃষ্টির রহস্য, মানব শরীরবৃত্তীয়, জীবনাচরণ ও ধর্মীয় বিধি পালন -এ কুরআনিক বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা।)" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কামরুন নাহার, আইডিঃ ২১৫০০১৩৮১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “কুরআন ও বিজ্ঞান (সৃষ্টির রহস্য, মানব শরীরবৃত্তীয়, জীবনাচরণ ও ধর্মীয় বিধি পালন এ কুরআনিক বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনা)” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

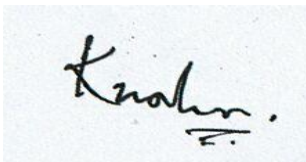

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

কামরুন নাহার

আইডিঃ ২১৫০০১৩৮১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
উৎসর্গ	৬
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৭
গবেষকের সীমাবদ্ধতা	৮
ভূমিকা	৯-১৩
১। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবর্তনবাদ	১৪
১.১। জৈবিক বিবর্তন	১৫-১৬
১.২। ইতিহাস: প্রারম্ভিক দৃষ্টিভঙ্গি	১৭-১৯
১.৩। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি	২০-২৫
১.৪। মহাবিশ্ব সৃষ্টি	২৬-২৭
১.৫। জীবন সৃষ্টি	২৮
১.৬। মানবজাতি সৃষ্টি	২৯-৩০
১.৭। পরিসংখ্যান	৩১-৩২
২। জ্যোতির্বিদ্যা	
২.১। ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ	৩৩-৩৪
২.২। মহাকাশবিজ্ঞান	৩৫-৩৬
২.৩। সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল	৩৭-৩৮
২.৪। পঙ্কিল জলাশয়ে সূর্যের অস্তগমন	৩৯
২.৫। নক্ষত্রের পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি	৪০
২.৬। আকাশের সংখ্যা	৪১
২.৭। নিম্নতম আকাশে নক্ষত্ররাজির অবস্থান	৪২
২.৮। সূর্য ও চন্দ্রের আলো	৪৩-৪৪
২.৯। চন্দ্র বিদারণ	৪৫-৪৬
২.১০। মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়কাল	৪৭-৪৮
২.১১। সাত পৃথিবী	৪৯
২.১২। ছায়ার অবস্থান পরিবর্তন	৫০
২.১৩। আকাশ মাথার উপর ভেঙে পড়া	৫১
২.১৪। নক্ষত্র শয়তানের প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র	৫২-৫৩

৩। জীববিদ্যা	
৩.১। কুরআনে ভ্রূণবিদ্যা	৫৪-৬০
৩.২। পরাগায়ন	৬১-৬২
৩.৩। হৃদপিণ্ডের কার্যাবলি	৬৩
৪। ভূতত্ত্ববিদ্যা ও আবহাওয়াবিদ্যা	
৪.১। পৃথিবী সমতল	৬৪-৬৫
৪.২। বৃষ্টির পানির বিশুদ্ধতা	৬৬
৪.৩। অসম্পূর্ণ পানিচক্র	৬৭-৬৮
৪.৪। আকাশস্থিত পর্বত হতে শিলা আসে	৬৯
৫। প্রাণিবিদ্যা	৭০
৬। ইসলামিক বিধিবিধান ও এর বৈজ্ঞানিক কার্যকারীতা	
৬.১। মন নিমন্ত্রণে সালাতের গুরুত্ব	৭১-৭৪
৬.২। নামাযের মাধ্যমে শারীরিক উপকারিতাসমূহ	৭৫-৭৮
৬.৩। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অজুর গুরুত্ব	৭৯-৮০
৬.৪। মুসলমানরা কেন মসজিদে হেঁটে যায়	৮১
৬.৫। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে গুরুত্ব	৮২-৮৩
৬.৬। নারী ও পুরুষের শরীরে স্ট্রেসের ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব	৮৪-৯৪
শেষ কথা	৯৫
তথ্য-উপাত্ত সমূহ	৯৬

উৎসর্গ

মহান রব

আমার মা-বাবা, আমার পরিবার, আমার মাদরাসা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ

এবং আমার জীবনসঙ্গী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতি, তাঁর অসীম রহমতে ধৈর্য ধরে আমি আমার গবেষণাটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ উস্তায এবং জনাব সাইফুউদ্দিন শাকিল উস্তাযকে। গবেষণাকর্মটির প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে অভিসন্দর্ভ জমা দেওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টিতে তিনি নিরলসভাবে আমাকে নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। আব্দুল ওয়াহিদ উস্তায প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি বিভিন্নভাবে গবেষণা কার্যে দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য।

আমার তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ উস্তাযকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি আমাকে তথ্য ও বই- পুস্তক দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমার সহপাঠী মোছাঃ রেখা ইয়াসমিন গবেষণাকার্যে সহায়তা করায় আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি বিনয়ের সাথে আরো স্মরণ করছি আমার বাবা মোঃ ফজলুর রহমান ও মা হোসনেআরা বেগম কে আরও স্মরণ করছি আমার বোন ফারজানা ইয়াছমিন, ফাহিমা সুলতানা এবং আমার পরিবার তাঁদের অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সহযোগিতা আমাকে চলার পথে সাহস যুগিয়েছে ও গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে। এজন্য আমি তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এবং আমার কাজিন সুমাইয়া আক্তার মিলি যিনি এ গবেষণা কাজে সহায়তামূলক মনোভাব পোষণ করার জন্য।

সর্বশেষ কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি আমার জীবনসঙ্গীকে যার প্রচেষ্টা ব্যতীত এ গবেষণা কর্মটি দ্রুত করা সম্পন্ন করা হয়ত সম্ভব হত না। যার সহযোগীতায় এই গবেষণাটি তথ্যবহুল, শিক্ষাপ্রদ ও তাৎপর্যবহ করা সম্ভবপর হয়েছে।

গবেষকের সীমাবদ্ধতা

সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে অর্জন লক্ষ্যে সকলের ছুটে চলা। বদ্ধতায় পরিভাষিত মানবজীবনের সীমাবদ্ধতা থেকে অধিকাংশ সময় অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বদ্ধতা এঁটে যাওয়া থেকে ছুটে চলা জীবনের পরিধি থেকে বের হয়ে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় এই পথচলা।

এই গবেষণার ক্ষেত্রেও তেমনি অনেক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গতিধারা বুঝা সীমাবদ্ধতা, থিসিস সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তের সীমাবদ্ধতা এবং তেমনি আরো অনেক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিলো সময়ের সল্পতা। স্বল্প সময়ে কাজটি করার দরুন এই গবেষণায় কোনরূপ নিজস্বতা নেই। গবেষনাটি মৌলিক কোন কার্যক্রম নয়। আমার সীমাবদ্ধ থেকেই এই থিসিসে কোন মৌলিক গবেষণা করা আমার পক্ষ থেকে সম্ভবপর হয়নি।

বরং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থেকেই এটি শুধু একটি ইন্টারনেট লব্ধ ইসলামের আলোকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার তথ্য-উপাত্তের সংকলন মাত্র।

ভূমিকা

একটা সময় পর্যন্ত পৃথিবীর মানবসমাজের বিশ্বাস ছিলো এই পৃথিবী সমতল; গোল নয়। বিভিন্ন তত্ত্ব-পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা একমত হয় এই পৃথিবীর আকৃতি গোল বা কমলালেবুর মত। যেই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এতো সময়ের গবেষণা, যুক্তি-খন্ডন প্রয়োজন ছিলো, সেই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আলাহ তা'আলা বলেন-

“তিনি (আল্লাহ) রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিবস দিয়ে রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন…।” — সুরা: জুমার, আয়াত : ৫

এ আয়াতে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের বিষয়টিকে 'ইকাউভিরু/ইউকাউ-ইরু' শব্দ দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ খুঁজলে দেখা যায়, এর অর্থ 'কোনো কিছু গোল বানানো', যেমন - মাথায় পাগড়ি প্যাঁচানো। যদি পৃথিবী গোল না হতো, তাহলে এভাবে চক্রাকারে দিনের পর রাতের আবর্তন সম্ভব হতো না। কোরআনে পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে সরাসরি কিছু বলা হয়নি, কিন্তু বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আমরা ঠিকই এর ব্যাপারে ধারণা পেতে পারি। কোরআন কোন বিজ্ঞানের বই নয়, তবে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ মানুষকে পথ দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের আলোকে। তাই আজ বিজ্ঞান ও কোরআনের তুলনামূলক অধ্যয়ন পৃথিবীতে এতো জনপ্রিয়।

বিজ্ঞান ও কুরআন

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী নিধাল গেসুম যুক্তি দেন যে কুরআন "জ্ঞানের ধারণা" তৈরি করেছে যা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে উৎসাহিত করে। তিনি লেখেন: "কোরআন প্রমাণ ছাড়া অনুমান করার বিপদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে (এবং যে বিষয়ে আপনার (নিশ্চিত) জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করবেন না।… ১৭:৩৬) এবং বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদের প্রমাণের প্রয়োজন হতে বলেছে (বলুন: আপনার প্রমাণ আনুন যদি আপনি সত্যবাদী হন ২:১১১), ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই।"

Guessoum "প্রমাণ" এর সংজ্ঞায় গালেব হাসানকে উদ্ধৃত করেছেন কুরআন অনুসারে "স্পষ্ট এবং শক্তিশালী... বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা যুক্তি।" এছাড়াও, এই ধরনের প্রমাণ ৫:১০৪ আয়াত উদ্ধৃত করে কর্তৃপক্ষের যুক্তির উপর নির্ভর করতে পারে না। পরিশেষে, শ্লোক ৪:১৭৪ অনুসারে, দাবী এবং প্রত্যাখ্যান উভয়েরই একটি প্রমাণের প্রয়োজন হয়। ইসমাইল আল-ফারুকী এবং তাহা জাবির আলাওয়ানি মনে করেন যে মুসলিম সভ্যতার যে কোনো পুনর্জাগরণ অবশ্যই কুরআন দিয়ে শুরু হতে হবে; যাইহোক, এই পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল "তাফসীর (তফসীর) এবং অন্যান্য ধ্রুপদী শাখার শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য" যা কুরআনের বাণীর "সার্বজনীন, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং পদ্ধতিগত ধারণা"কে বাধা দেয়। দার্শনিক মুহম্মদ ইকবাল কুরআনের পদ্ধতি ও জ্ঞানতত্ত্বকে অভিজ্ঞতামূলক ও যুক্তিবাদী বলে মনে করেন।

Guessoum আরও পরামর্শ দেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কুরআনের পাঠকে প্রভাবিত করতে পারে, এই বলে যে "দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানরা বিশ্বাস করত, কিছু কোরানের আয়াতের আক্ষরিক বোঝার ভিত্তিতে, একটি অনাগত শিশুর লিঙ্গ শুধুমাত্র ঈশ্বর জানেন, এবং স্থানটি এবং আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর সময়ও একইভাবে আল-গাইব [অজানা/অদেখা]। আধুনিক বৈজ্ঞানিক (চিকিৎসা) জ্ঞানের মুখোমুখি হলে এই ধরনের আক্ষরিক বোঝাপড়া অনেক মুসলমানকে বুঝতে পেরেছিল যে কুরআনের প্রথম স্তরের পাঠ দ্বন্দ্ব এবং দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে।"

সাইয়্যেদ কুতুবের মত ইসলামপন্থীরা যুক্তি দেন যে যেহেতু "ইসলাম "মুসলমানদের" আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেছে এবং তাদের সমস্ত বিজ্ঞান শেখার জন্য দায়ী করেছে," বিজ্ঞান প্রকৃত ইসলামের সমাজে উন্নতি করতে পারে না। (তবে, যেহেতু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির সরকারগুলি সম্পূর্ণরূপে শরিয়া আইন অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সত্যিকারের ইসলাম

বিরাজ করেনি এবং এটি কুতুবের মতে, মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান এবং অন্যান্য অনেক কিছুর ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করে।

অন্যরা দাবি করে যে ইসলামের ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। লেখক রডনি স্টার্ক যুক্তি দেন যে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের (মোটামুটি) পরে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে পশ্চিমের তুলনায় ইসলামের পিছিয়ে ছিল "প্রাকৃতিক আইন" সহ প্রাকৃতিক ঘটনার পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা প্রণয়নের প্রচেষ্টার প্রথাগত উলামাদের বিরোধিতার কারণে। তিনি দাবি করেন যে তারা বিশ্বাস করেছিল যে এই ধরনের আইনগুলি নিন্দাজনক কারণ তারা "আল্লাহর কাজ করার স্বাধীনতাকে তাঁর ইচ্ছামত সীমিত করে, একটি নীতি ১৪:৪ আয়াতে নিশ্চিত করা হয়েছে: "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথে পাঠান এবং যাকে তিনি ইচ্ছা পথ দেখান" (তারা বিশ্বাস করেছিল)) শুধুমাত্র মানবতার জন্য নয় সমস্ত সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য।

ট্যানার এডিস লিখেছেন এন ইলুশন অফ হারমোনি: ইসলামে বিজ্ঞান ও ধর্ম। এডিস উদ্বিগ্ন যে তুরস্কের সবচেয়ে পশ্চিমা মুসলিম দেশগুলির মধ্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষতা বেরিয়ে আসার পথে; তিনি উল্লেখ করেছেন যে তুরস্কের জনসংখ্যা একটি বড় সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা বিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করে। এডিসের কাছে, অনেক মুসলমান প্রযুক্তির প্রশংসা করে এবং এর সৃষ্টিতে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে সম্মান করে। ফলস্বরূপ, তিনি বলেছেন যে এই সম্মানকে অন্যান্য সম্মানিত ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে মিলিত করার জন্য প্রচুর ইসলামী ছদ্মবিজ্ঞানের প্রচেষ্টা রয়েছে। এডিস মনে করেন যে পবিত্র বইগুলিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য পড়ার প্রেরণা খ্রিস্টানদের তুলনায় মুসলমানদের জন্যও শক্তিশালী। কারণ, এডিসের মতে, মুসলিম বিশ্বে কুরআনের প্রকৃত সমালোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। যদিও খ্রিস্টান ধর্ম তার পবিত্র গ্রন্থকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বাণী হিসেবে দেখার প্রবণতা কম, কম মুসলিমরা এই ধারণার সাথে আপস করবে – যার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি কেবলমাত্র কুরআনে উপস্থিত হওয়া উচিত।

যাইহোক, এডিস যুক্তি দেন যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অন্তহীন উদাহরণ রয়েছে যেগুলো বাইবেল বা কুরআনে পড়া যেতে পারে যদি কেউ চায়। এডিস যোগ্যতা অর্জন করে যে শুধুমাত্র কুরআন দেখে মুসলিম চিন্তাভাবনা অবশ্যই বোঝা যায় না; সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি বড় ভূমিকা পালন করে।[1]

অলৌকিক সাহিত্য

১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে, কুরআনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপস্থিতির ধারণাটি ইজাজ (অলৌকিক) সাহিত্য হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যাকে "বুকাইলিজম"ও বলা হয়, এবং মুসলিম বইয়ের দোকান এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিতরণ করা শুরু হয় এবং টেলিভিশন প্রোগ্রামে ইসলামিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। প্রচারক। আন্দোলনটি দাবি করে যে কুরআন "বৈজ্ঞানিক তথ্য" দ্বারা সমৃদ্ধ যা বিজ্ঞানের দ্বারা তাদের আবিষ্কারের কয়েক শতাব্দী আগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা তখনকার মানুষের দ্বারা "জানা যেত না"। এটি ইসলামী সৃষ্টিবাদের সাথে ওভারল্যাপ করে।

লেখক জিয়াউদ্দিন সরদারের মতে, ইজাজ আন্দোলন একটি "মুসলিম সমাজে বৈশ্বিক উন্মাদনা" তৈরি করেছে এবং এটি একটি শিল্পে বিকশিত হয়েছে যা "বিস্তৃত এবং ভাল অর্থায়নে"। আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে আব্দুল মাজিদ আল-জিন্দানি, যিনি কুরআন ও সুন্নাহতে বৈজ্ঞানিক লক্ষণের কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; জাকির নায়েক, ভারতীয় টেলিভ্যাঞ্জেলিস্ট; এবং আদনান ওকতার, তুর্কি সৃষ্টিবাদী।

আন্দোলনের উত্সাহীরা যুক্তি দেন যে কুরআনে পাওয়া অলৌকিকতার মধ্যে "সবকিছু, আপেক্ষিকতা থেকে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, বিগ ব্যাং তত্ত্ব, ব্ল্যাক হোল এবং পালসার, জেনেটিক্স, ভ্রূণবিদ্যা, আধুনিক ভূতত্ত্ব, তাপগতিবিদ্যা, এমনকি

[1] *https://dawatulislam24.com/?menu=NewsDetail&menuName=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8&Detail=5109*

লেজার এবং হাইড্রোজেন জ্বালানী কোষ"। জাফর ইসহাক আনসারী পবিত্র গ্রন্থের "বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা" হিসাবে কুরআনে "বৈজ্ঞানিক সত্য" সনাক্তকরণের দাবি করার আধুনিক প্রবণতাকে অভিহিত করেছেন।

একটি উদাহরণ হল "সুতরাং আমি সেই নক্ষত্রের শপথ করছি যারা দৌড়ায় এবং লুকিয়ে থাকে ..." (৮১:১৫-১৬), যা সমর্থকরা দাবি করেন যে ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআনের জ্ঞান প্রদর্শন করে; বা: "আমি শপথ করে বলছি চাঁদ তার পূর্ণতায় যাত্রা করবে যে আপনি পর্যায় থেকে পর্যায় পর্যন্ত যাত্রা করবেন" (৮৪:১৮-১৯) প্রবক্তাদের মতে, বাইরের মহাকাশে মানুষের ফ্লাইটকে বোঝায়।[2]

[2] *প্রাগুক্ত*

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবর্তনবাদ

আস্তিক্যবাদী বিবর্তন থেকে শুরু করে প্রাচীন পৃথিবী সৃষ্টিবাদ পর্যন্ত বিবর্তন সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বৈচিত্র্যময়। সারা বিশ্বের কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে "মানুষ ও অন্যান্য জীবিত জিনিস সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে", তবে বাকিদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে জীব "সর্বদা বর্তমান আকারে বিদ্যমান"। কিছু মুসলিম বিশ্বাস করে যে জলমিশ্রিত সান্দ্র কাদামাটির মতো পদার্থের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবনের প্রক্রিয়াগুলো প্রজাতির একটি একক বিন্দু থেকে শুরু হয়েছিলো। মুসলিম চিন্তাবিদরা বিবর্তন তত্ত্বের উপাদানগুলো প্রস্তাব ও গ্রহণ করেছেন, কেউ কেউ এই প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসকে ধরে রেখেছেন। কিছু পণ্ডিত পরামর্শ দিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ সৃষ্টি ও বিবর্তনের উভয় আখ্যানকে আধুনিক মুসলমানরা দুটি ভিন্ন ধরনের সত্য হিসেবে সম্বোধন করে প্রকাশিত ও অভিজ্ঞতামূলক বলে বিশ্বাস করতে পারে। অন্যরা যুক্তি দেয় যে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একত্রিত হতে পারে এবং একে অপরের পরিপূরক হতে পারে।[3]

[3] *https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0*

১.১। জৈবিক বিবর্তন

কোরআনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিষয় নিয়ে অনেক আয়াত রয়েছে; মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তায়ালা ছয় আইয়াম (দিন বা মহাযুগ; প্রকৃত অর্থ নিয়ে বিতর্ক আছে)-এ এই মহাবিশ্ব ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন;, পৃথিবী দুই আইয়ামে সৃষ্টি করা হয়েছে,, এবং আরও দুই আইয়ামে (মোট চার দিনে) ঈশ্বর পৃথিবীকে সজ্জিত করেছেন পাহাড়, নদী এবং ফল-বাগান দ্বারা। আকাশ ও পৃথিবী গঠিত হয়েছে একটি বিষয় থেকে যাকে বিভক্ত করতে হয়েছিল,, আকাশ ধূমায়িত ছিল, এবং স্তরগুলি একটির উপর অন্যটি সজ্জিত অবস্থায় আছে। ফেরেশতা সপ্তম আকাশের মধ্যে বাস করে। সর্বনিম্ন স্বর্গ নুর বা আলো দিয়ে সজ্জিত সূর্য এবং চন্দ্র (যা নিয়মিত পথ অনুসরণ করে), তারা এবং রাশিচক্রের নক্ষত্রপুঞ্জ।

জৈবিক বিবর্তন এবং মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে বর্তমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সাথে মুসলমানদের একটি দল একমত নয়। তবে বিভিন্ন বিখ্যাত মুসলমান বিজ্ঞানী যেমন ইবনে সিনা, ইবনে খালদুন, ইবনে আরাবির মতো বিজ্ঞানীরা ডারউইনের মতোই বিবর্তনবাদের স্বপেক্ষে প্রমাণসহ একই মত পোষণ করতেন। কয়েক'শ বছর পূর্বেও বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসায় বিবর্তনবাদ পড়ানো হতো। কুরআনে মানব বিবর্তন সম্পর্কে যেসব আয়াতে যুক্তি দেয়া হয়েছে, তা ডারউইনীয় চিন্তার বিবর্তনবাদ থেকে আলাদা ও উন্নত বলে দাবি করেছেন চার্লস ডারউইনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী উইলিয়াম ড্রেপার। এধরনের বিবর্তনবাদের ধারণা ইসলামের নবি মুহাম্মাদের সময় থেকেই প্রচলিত ছিল বলে ড্রেপার এর নামকরণ করেন "মোহামেডান থিওরি অফ ইভোলিউশন" বা মুহাম্মাদীয় বিবর্তনবাদ তত্ত্ব।

“আর আমি (আল্লাহ) তোমাদের বিকাশিত করেছি, তারপর আকার দিয়েছি।” [কুরআন ৭:১১]

এই আয়াতে বিকাশিত বলতে বিবর্তনবাদকে নির্দেশ করে। কুরআনের মতে মানুষের বিবর্তনের সুচনা হয় খনিজ পদার্থ থেকে। আর এই কোনো আয়াতে সময়ের কথা বলা হয় নি। সুতরাং বিবর্তন বিষয়টি কুরআনে একদিনে বা ঐ রকম কোনো সময়ে সংঘটিত

হয়েছে এরকম কোনো বিষয় কুরআনে উল্লেখিত নেই। প্রকৃত পক্ষে এরকম বহু আয়াত কুরআনে রয়েছে, যেখানে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আরো অনেক বিষয় বর্ণিত আছে।

একটি সাম্প্রতিক পিউ গবেষণা প্রকাশ করে যে, ২২ টি দেশের মধ্যে মাত্র চারটি দেশের অন্তত পক্ষে ৫০ শতাংশ মানুষ বিবর্তন প্রত্যাখ্যান করেছে। উদাহরণস্বরূপ, তুলনামূলকভাবে বৃহৎ সংখ্যক মানুষ কাজাখিস্তান (৭৯%) এবং লেবানন (৭৮%) মানুষের মধ্যে মানুষের বিবর্তন গ্রহণ করে, তবে আফগানিস্তানে তুলনামূলকভাবে কম (২৬%), ইরাক (২৭%) এবং পাকিস্তান (৩০%) মধ্যে; মোট জরিপের ১৩ টি দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার সমীক্ষায় দেখা গেছে যারা সময়ের সাথে মানুষের বিবর্তিত বিবৃতির সাথে একমত হন। অটোমান বুদ্ধিজীবী ইসমাইল ফেনী ব্যক্তিগতভাবে ডারউইনবাদকে প্রত্যাখ্যান করলেও জোর দিয়েছিলেন যে এটি স্কুলে শেখানো উচিত কারণ মিথ্যা তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের উন্নতিতে অবদান রাখে । তিনি মনে করেন যে কোরআনের ব্যাখ্যাগুলি সংশোধনীর প্রয়োজন হতে পারে যদি ডারউইনবাদকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয়।[4]

[4]*মূল নিবন্ধ: ইসলামের দৃষ্টিতে বিবর্তন*
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%93_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8

১.২। ইতিহাস: প্রারম্ভিক দৃষ্টিভঙ্গি

কিতাব আল-হায়াওয়ান ('প্রাণিপুস্তক') বইতে ৯ম শতাব্দীর মুসলিম পণ্ডিত আল-জাহিহি প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন যেমন প্রাণী ভ্রূণবিদ্যা, অভিযোজন ও প্রাণী মনোবিজ্ঞান। আল-জাহিহ একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন যা হলো সম্পদের জন্য শক্তিশালী ইঁদুর ছোট পাখির তুলনায় ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম, এটি "অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম"-এর আধুনিক দিনের তত্ত্বের একটি উল্লেখ। আল-জাহিহ খাদ্যশৃঙ্খলের বর্ণনাও লিখেছেন।

প্রাণীরা অস্তিত্বের জন্য ও সম্পদের জন্য, ভক্ষণ হওয়া থেকে এড়াতে এবং বংশবৃদ্ধির জন্য লড়াই করে... পরিবেশগত কারণগুলো জীবকে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য নতুন বৈশিষ্ট্য বিকাশে প্রভাবিত করে, এইভাবে এগুলো তাদের নতুন প্রজাতিতে রূপান্তরিত করে। যে প্রাণীরা বংশবৃদ্ধির জন্য বেঁচে থাকে তারা তাদের সফল বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের সন্তানদের কাছে প্রেরণ করতে পারে। —আল-জাহিহ, প্রাণিপুস্তক

বসরায় ১০ম শতাব্দীতে সাফা ভ্রাতাদের বার্তা নামক একটি ইসলামি বিশ্বকোষ প্রাচীনতম প্রত্যয়িত বিবর্তনীয় কাঠামোর প্রবর্তন করে। বিশ্বকোষটি সত্তার মহাশৃঙ্খলের প্লেটোনীয় ও এরিস্টটলীয় ধারণার উপর প্রসারিত হয়েছে। এটি একটি কার্যকারণ সম্পর্কের প্রস্তাব করার মাধ্যমে সৃষ্টির প্রক্রিয়া হিসেবে শৃঙ্খলকে অগ্রসর করে। পদার্থের সৃষ্টি ও শক্তির সাথে এর বিনিয়োগের সাথে শুরু হয়, যার ফলে জলীয় বাষ্প তৈরি হয়। এটি পরে খনিজ ও "খনিজ জীবন" হয়ে ওঠে। শাখা-সদৃশ গঠন সহ প্রবাল সর্বোচ্চ খনিজ জীবন ছিলো যা নিম্নগামী উদ্ভিদের জন্ম দেয়। খেজুরকে সর্বোচ্চ উদ্ভিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিলো যা নিম্ন প্রাণীদের জন্ম দেয় এবং তারপরে বানরের মাধ্যমে বর্বর মানুষ, তারপরে সাধু ও নবীরা সহ উচ্চতর মানুষ এসেছিলো। তারপরে শৃঙ্খলটি কম কার্যকারণ ও স্বচ্ছতা ব্যবহার করে ঐতিহ্যগত আকারে চলতে থাকে, যেখানে ফেরেশতারা মানুষের উপরে এবং ফেরেশতাদের উপরে সৃষ্টিকর্তা ও চূড়া উভয়ই হিসেবে আল্লাহর অবস্থান রাখা হয়। রচনায় পাওয়া এই ধারণাটির সংক্ষিপ্তসারে মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ বলেছেন: "সবকিছু তাঁর থেকে

শুরু হয় এবং সবকিছু তাঁর কাছে ফিরে আসে।" যাইহোক, কিছু পণ্ডিত প্রাক-ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে এই বইয়ের সমালোচনা ও বাতিল করেছেন।

সামি এস হাউইয়ের মতে, ১১শ শতাব্দীর পারস্যের পন্ডিত ইবনে মিসকাওয়াইহ তার ফাওজ আল-আসাগর-এ মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে লিখেছেন।

১৪শ শতাব্দীর প্রভাবশালী ইতিহাস রচয়িতা ও ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন মুকাদ্দিমা-এ লিখেছেন যাকে তিনি "সৃষ্টির ক্রমিক প্রক্রিয়া" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিছু ভাষ্যকারের মতে ইবনে খালদুনের কিছু চিন্তাধারা বিবর্তনের জৈবিক তত্ত্বকে অনুমান করে। ইবনে খালদুন জোর দিয়েছিলেন যে মানুষ "বানরের জগৎ" থেকে বিকশিত হয়েছে, এটি এমন একটি প্রক্রিয়ায় যার দ্বারা "প্রজাতিগুলো আরও অসংখ্য হয়ে ওঠেছে"। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ হলো প্রাণীদের সবচেয়ে বিবর্তিত রূপ, যার মধ্যে তাদের যুক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে পৃথিবী "খনিজ"-এর মতো অ্যাবায়োটিক উপাদান দিয়ে শুরু হয়েছিলো। ধীরে ধীরে, উদ্ভিদের আদিম পর্যায় যেমন "ভেষজ ও বীজহীন উদ্ভিদ" এবং অবশেষে "তাল ও লতা" বিকশিত হয়।

শোয়েব আহমেদ মালিক ইঙ্গিত করেছেন যে ইবনে খালদুনের তত্ত্বটি বানর ও মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার স্বীকৃতির জন্য উল্লেখযোগ্য হলেও, প্রয়াত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারণার প্রেক্ষাপটে এটাকে মহাশৃঙ্খলের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এই তত্ত্বটি সৃষ্টির সমস্ত সত্ত্বার মধ্যে একটি সংযুক্ত শ্রেণিবিন্যাসের অনুমান করে কিন্তু সঠিকভাবে এটি বিবর্তনের তত্ত্ব নয়। সত্তার মহান শৃঙ্খলের ব্যবস্থাটি খনিজ থেকে উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ, ফেরেশতা ও আল্লাহর শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটি মানবিশিষ্ট সাদৃশ্য বোঝায়, তবে একটি অস্থায়ী প্রক্রিয়া নয় যেখানে একটি প্রজাতি অন্যটি থেকে উদ্ভূত হয়। যদিও কিছু অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বতন্ত্র আত্মা ঐশ্বরিকতার সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য 'মই' বেয়ে উপরে উঠতে পারে, প্রজাতিগুলো (অথবা এরিস্টটলীয় ও নব্যপ্লেটোনীয় তত্ত্ববিদ্যার ভাষায় 'উপস্থিত রূপ') নিজেরাই চিরন্তন ও স্থির। মালিক আরও উল্লেখ করেছেন যে প্রায়শই প্রসঙ্গ বিবেচনা না করে মুকাদ্দিমা থেকে উদ্ধৃত করা হয়। একটি ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত

উক্তিটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত অর্থ নামক একটি অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে, এটি যুক্তি দেয় যে নবীরা ফেরেশতাদের নীচে অবস্থিত মহাশৃঙ্খলের একটি স্থান দখল করে। ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে এটি ব্যাখ্যা করে যে কেন স্বতন্ত্র নবীরা অস্থায়ীভাবে ফেরেশতাদের পদে আরোহণ করতে পারে ও তাদের সাথে ঐশ্বরিক জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারে, যা তারা বাণী আকারে মানবতার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারে। মালিকের মতে, বৈজ্ঞানিক বিবর্তন তত্ত্বের একটি প্রাথমিক রূপের ব্যাখ্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত যে কীভাবে ফেরেশতা, নবী ও আত্মার ঊর্ধ্বগামী আরোহন সেই তত্ত্বের সাথে খাপ খায়।[5]

[5] *https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0*

১.৩। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী

কিছু আলেম সম্প্রদায়ের মাঝে বিবর্তন সত্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস শিরোনামের বইতে একজন বিজ্ঞানী ও চার্লস ডারউইনের সমসাময়িক জন উইলিয়াম ড্রেপার সনাতনপন্থী মণ্ডলী কর্তৃক "নিম্ন রূপ থেকে মানুষের বিবর্তন বা তার ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের জন্য দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তার বর্তমান অবস্থার উন্নয়নের মোহাম্মদীয় তত্ত্ব" অস্বীকৃতির জন্য সমালোচনা করেছিলেন।" যাইহোক, ড্রেপারের বইটিতে ঐতিহাসিক নির্ভুলতার অভাব রয়েছে বলে সাম্প্রতিককালের পণ্ডিতদের দ্বারা সমালোচনা করা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ইসলামি পুনরুজ্জীবনের একজন আলেম জামাল উদ্দিন আফগানি ডারউইনের সাথে একমত হন যে জীবন উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অন্য জীবনের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির মতো ধারণার ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। যাইহোক, তিনি স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করতেন যে জীবন নিজেই আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট; ডারউইন জীবনের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেননি, শুধু বলেছেন "সম্ভবত এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত জৈব প্রাণীই কোনো না কোনো আদিম রূপ থেকে এসেছে, যেখানে প্রাণ প্রথম ফুঁকে দেওয়া হয়েছিলো।"

আল-আফগানির একজন সমসাময়িক উসমানীয়-লেবানীয় সুন্নি পণ্ডিত হুসেইন আল-জিসর ঘোষণা করেছেন যে বিবর্তন ও ইসলামি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তিনি বলেছিলেন যে "কুরআনে এমন কোন প্রমাণ নেই যেখানে এটি বলে যে আল্লাহর কৃপায় বিদ্যমান সমস্ত প্রজাতি একযোগে বা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে" এবং সূরা আল-আম্বিয়াতে সৃষ্টির পূর্বোক্ত কাহিনী উল্লেখ করেছেন।

প্রয়াত উসমানীয় বুদ্ধিজীবী ইসমাইল ফেনি ব্যক্তিগতভাবে ডারউইনবাদকে প্রত্যাখ্যান করার সময় জোর দিয়েছিলেন যে এটি বিদ্যালয়ে পড়ানো উচিত কেননা এমনকি মিথ্যা

তত্ত্বও বিজ্ঞানের উন্নতিতে অবদান রাখে। তিনি মনে করেন যে ডারউইনবাদকে শেষ পর্যন্ত সত্য বলে দেখানো হলে কুরআনের ব্যাখ্যার সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে।

কামালীয় তুরস্কে, তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রথম দশকের গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতরা ইসলামি ধর্মগ্রন্থে বিবর্তন তত্ত্বকে সমন্বয় করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন; এই তত্ত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সময়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মুখে ইসলামি বিশ্বাসকে রক্ষা করেছিলো। অন্যদিকে সৌদি আরব সরকার ১৯৭০-এর দশকে ইসলামের সালাফি-ওয়াহাবি ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিবর্তন অস্বীকারকে অর্থায়ন ও প্রচার শুরু করে। এই অবস্থানটি প্রাথমিকভাবে বিবর্তন শেখানো ও প্রচার করা তুরস্ক, পাকিস্তান, লেবানন, এবং ইরানের মতো প্রধান মুসলিম দেশগুলোর সরকার ও শিক্ষাবিদদের নিকট থেকে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

একবিংশ শতাব্দী

সমসাময়িক যুগে বিবর্তনকে সমর্থনকারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু মুসলিম রয়েছে, কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগ পরবর্তী মুসলিম বিশ্বের মূলধারার পণ্ডিতরা বিবর্তনকে গ্রহণ করেননি। যাইহোক, কিছু পণ্ডিত যুক্তি দেন যে এমনকি বিবর্তন কুরআনের আক্ষরিক পাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাকৃতিক নির্বাচন সহ বিবর্তনের ধারণাগুলো অনেক মুসলিম দেশে পাঠ্যসূচিতে উপস্থাপিত হলেও মানব বিবর্তনের স্পষ্ট আলোচনা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। যদিও পাকিস্তান বাদে বিবর্তনীয় বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় প্রসঙ্গ স্বাভাবিক নয়।

ইসলামিক সোসাইটি অফ ব্রিটেনের খালিদ আনিস ২০০৪ সালে ইসলাম ও বিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন:
ইসলামের নিজস্ব বিবর্তনীয় সৃষ্টিবাদ/আস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদের নিজস্ব চিন্তাধারাও রয়েছে, এটি মনে করে যে মহাবিশ্বের উৎপত্তির মূলধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কুরআন দ্বারা সমর্থিত। অনেক মুসলমান বিশেষ করে সুন্নি ও শিয়া মুসলমানদের মধ্যে এবং ইসলামের মধ্যে উদারপন্থী আন্দোলনকারীরা বিবর্তনীয় সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস করে। ইসলামের

পণ্ডিতদের মধ্যে এরজুরুমের ইব্রাহিম হাক্ক, যিনি ১৮শ শতাব্দীতে তৎকালীন উসমানীয় সাম্রাজ্য তথা বর্তমান তুরস্কের প্রজাতন্ত্রের এরজুরুমে বাস করতেন, তিনি এটা বলার কারণে বিখ্যাত হয়েছেন যে 'উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে স্পঞ্জ আছে এবং প্রাণী ও মানুষের মধ্যে বানর রয়েছে'।

সমসাময়িক ইসলামি পণ্ডিত গোলাম আহমেদ পারভেজ, এদিপ ইয়ুকসেল, ও টো শানাভাস তাদের ইসলামিক থিওরি অফ ইভোলিউশন: দ্য মিসিং লিংক বিটুইন ডারউইন অ্যান্ড দ্য অরিজিন অফ স্পেসিস, বইতে বলেছেন যে বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভবের বিষয়ে কুরআনের অসংখ্য সূত্রের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

যদিও মুসলিম পণ্ডিত নবীন পৃথিবী সৃষ্টিবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন, ও দাবি করেন যে আদিপুস্তকে সৃষ্টির কাহিনী বিকৃত হয়ে গেছে, সম্প্রতি কিছু মুসলিম দেশে খ্রিস্টান সৃষ্টিবাদীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত মূলভাব প্রচারের জন্য একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। কুরআন ও বাইবেল বেমানান বলে দাবি করার কারণে এই অবস্থানটির সমালোচনা করা হয়েছে।

দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে কিছু ব্রিটিশ মুসলিম ছাত্র ক্যাম্পাসে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিতরণ করেছে। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাজ্যে সৃষ্টিবাদ: বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস শিরোনানের একটি সম্মেলনে "ব্রিটেনের ইসলামিক সোসাইটির অধ্যাপক খালিদ আনিস বলেছিলেন যে 'মুসলিমরা কুরআন এবং যা বাস্তব ও দেখা যায় উভয়ের মাধ্যমে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করে। কুরআনে যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের বেঁচে থাকার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।"

হারুন ইয়াহিয়া ছদ্মনামেও পরিচিত আদনান ওকতার বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে একজন মুসলিম ওকালতিকারী। মুসলিম পণ্ডিতদের একটি যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে তাকে "ভণ্ড" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ইসলাম ও বিবর্তন বিষয়ক একটি সম্মেলনে তার প্রতিনিধিকে সম্মেলনের সময় ও পরে উপহাস করা হয়েছিলো। ইয়াহিয়ার বেশিরভাগ তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টিবাদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বুদ্ধিদীপ্ত নকশা

আন্দোলন থেকে নেওয়া হয়েছে। ওকতার তার ধারণা প্রচারের জন্য মূলত ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

মরিস বুকাইলি মুসলিম বিশ্বে কুরআন ও বিজ্ঞানের উপর তার ভাষ্যের জন্য বিখ্যাত, তিনি প্রারম্ভিক হোমিনিড প্রজাতি পর্যন্ত প্রাণীর বিবর্তন গ্রহণ করে ও তারপর আধুনিক মানুষের দিকে পরিচালিত একটি পৃথক হোমিনিড বিবর্তনকে গ্রহণ করে কুরআনের সাথে বিবর্তনকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলেন। যাইহোক, এই ধারণাগুলো জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা গৃহীত বিবর্তন তত্ত্ব থেকে ভিন্ন।

ইসলামের একজন সমসাময়িক প্রচারক ও সৃষ্টিবাদের প্রবক্তা জাকির নায়েক বিবর্তনবাদকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে এটি শুধুমাত্র একটি তত্ত্ব ও প্রমাণিত সত্য নয়। একজন বিশিষ্ট ইরানি ধর্মীয় পন্ডিত সাইয়্যেদ হোসাইন নাসরও সৃষ্টিবাদের একজন সমর্থক এবং তিনি "প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থাপন করা সুযোগ-সদৃশ পদ্ধতি"-এর মধ্যে বিদ্যমান অসঙ্গতি এবং তত্ত্বটি তার সূচনা থেকে যে সংশোধনীর মধ্য দিয়ে গেছে তার জন্য বিবর্তনকে অস্বীকার করেন; এই মতটি নসরের প্রাক্তন ছাত্র ওসমান বকরেরও অনুরূপ।

ইসলামের একজন পণ্ডিত ও বিবর্তনবাদের মানব ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির একজন প্রবক্তা নূহ হা মীম ক্যাল্লার বিশ্বাস করেন যে বিবর্তন কেবলমাত্র অ-মানব প্রজাতির জন্যই সম্ভব এবং মানুষকে বিবর্তনের দৃষ্টিতে দিয়ে দেখা যায় না কারণ মানুষ আল্লাহর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ধরনের সৃষ্টিকে বিশেষ বিবেচনায় প্রদান করা হয়েছে ও এইভাবে তিনি মানুষকে বিবর্তনের পথ থেকে অন্য জীবিতদের বিচ্ছিন্ন করেন।

সমসাময়িক পণ্ডিত ইয়াসির ক্বাদি বিশ্বাস করেন যে মানুষের বিবর্তিত ধারণাটি কুরআনের বিরুদ্ধে, কিন্তু তিনি বলেছেন যে আল্লাহ মানবতাকে মানব বিবর্তনের চেহারা দেওয়ার জন্য একটি বিবর্তনীয় ছাঁচে পুরোপুরিভাবে স্থাপন করেছেন।

আধুনিক পণ্ডিত উসামা আল-আজামি পরবর্তীতে যুক্তি দেন যে সৃষ্টির শাস্ত্রীয় আখ্যান ও আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত বিবর্তনকে আধুনিক মুসলমানরা প্রকাশিত ও

অভিজ্ঞতামূলক – এই দুটি ভিন্ন ধরনের সত্যকে সম্বোধন করা হয়েছে এই অর্থে বিশ্বাস করতে পারে।

অন্য একজন পণ্ডিত মুনির আল আলি যুক্তি দেন যে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একত্রিত হতে পারে এবং অস্তিত্বের জটিলতা ও রহস্য ব্যাখ্যা করতে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে।

একজন ইসলামি লেখক ডেভিড সলোমন জালাজেল বিবর্তনবাদের একটি ব্যতিক্রমী কেতাবি দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করেছেন যা তাওয়াক্কুফ-এর ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করে; তাওয়াক্কুফ হল এমন কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো যুক্তি না দাঁড় করানো যার জন্য কিতাবের কোনো ঘোষণা নেই। তাওয়াক্কুফের সাথে জালাজেল বিশ্বাস করেন যে আদমের সৃষ্টি অগত্যা মানবতার সূচনার সংকেত দেয় না কারণ কুরআন আদম অবতরণ করার আগে পৃথিবীতে মানুষ ছিল কিনা সে বিষয়ে কোন ঘোষণা দেয়নি। ফলস্বরূপ, জালাজেল তাওয়াক্কুফের আহ্বান জানায় যা ইঙ্গিত করে যে পৃথিবীতে আদমের আবির্ভাবের আগে মানুষের অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা কুরআনের কারণে সম্ভব এবং এটি সম্ভব যে আদমের বংশধর ও অন্যান্যদের মধ্যে মিলিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং, আদমের অস্তিত্ব একটি অলৌকিক ঘটনা কারণ কুরআন সরাসরি এটি বলেছে, তবে এটি দাবি করেনা যে পৃথিবীতে আদমের আবির্ভাবের সময় বিবর্তনের ফলে আসতে পারে এমন কোন মানুষ ছিলো না যা বিদ্যমান থাকতে পারতো। এই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিবাদ ও মানব ব্যতিক্রমবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে, এটি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করে যে বিবর্তনকে ইসলামের সাথে বিরোধ ছাড়াই দেখা যেতে পারে ও মুসলমানরা "আদমের গল্পের উল্লেখ ছাড়াই তার বৈজ্ঞানিক যোগ্যতার ভিত্তিতে মানব বিবর্তন" গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

ইয়াকিন ইসলামি গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্বারা ২০১৬ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্র লিখেছিল যে বিবর্তন তত্ত্বের প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে একমত নেই এবং এটিও পরিষ্কার নয় যে পণ্ডিতরা প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে যোগ্য কিনা।

২০১৭ সালে তুরস্ক বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের আগে বিবর্তন শিক্ষাদান শেষ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলো, সরকার দাবি করে যে এটি খুবই জটিল এবং "বিতর্কিত" একটি বিষয় যা তরুণদের দ্বারা বোঝা সম্ভভ না।

জর্ডানে বিবর্তন শিক্ষাদানকারী রানা দাজানি নামক একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিখেছেন যে তার প্রায় সকল শিক্ষার্থী ক্লাসের শুরুতে বিবর্তনবাদের ধারণার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, কিন্তু ক্লাসের শেষের দিকে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিবর্তনের ধারণাকে মেনে নেয়।

১.৪। মহাবিশ্ব সৃষ্টি

কিছু আধুনিক মুসলিম পণ্ডিত আল-সামা শব্দটি ব্যাখ্যা করার পক্ষে সমর্থন করেন, ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বাস করা হয় যে এটি আকাশ ও সাত আসমান উভয়কেই উল্লেখ করার পাশাপাশি সমগ্র মহাবিশ্বকেও উল্লেখ করে। তাই, তারা যুক্তি দেখায় যে কুরআন সূরা আম্বিয়াতে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে নিশ্চিত করেছে যেখানে কুরআন বলে যে বিভক্ত হওয়ার পূর্বে "আকাশমন্ডল ও পৃথিবী একক দেহ ছিল":
“যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, এরপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবু কি এরা ঈমান আনবে না?” —কুরআন ২১:৩০

কুরআনে যে মহা বিস্ফোরণের প্রাথমিক একাগ্রতা উল্লেখ করা হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে তা মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী ও মুহাম্মাদ আসাদের মতো মুসলিম পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন। অনেক মুসলমান বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে কুরআনের বিশ্ব সৃষ্টির কাহিনীকে ব্যাখ্যা করে এবং ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল, ইনকর্পোরেটেডের ফাহিম আশরাফ ও ইয়াকিন ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক রিসার্চের শেখ ওমর সুলেইমানের মত কিছু পণ্ডিত যুক্তি দেন যে সূরা যারিয়াতে একটি সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বর্ণনা রয়েছে:

“আমি আকাশকে নির্মাণ করেছি ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয়ই আমি বিস্তৃতি দাতা।”
—কুরআন ৫১:৪৭

কিছু আধুনিক পণ্ডিত বোঝেন যে সূরা ফুসসিলাতে উল্লিখিত "ধোঁয়া/গ্যাস" মহা বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট পরের অবস্থাকে নির্দেশ করতে পারে যখন মহাবিশ্ব প্রাথমিকভাবে গরম হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অবস্থায় ছিলো: “তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দান করলেন, যা ছিল ধোঁয়া রূপে। তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা চলে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল, আমরা ইচ্ছাক্রমেই আসলাম।”
—কুরআন ৪১:১১

বর্ণিত সময়কাল এই সমগ্র সৃষ্টির জন্য ৬ সময়কাল, অধিকাংশ মুসলিম এই মত পোষণ করে যে, এই ৬ দিন সৌর দিন নয় বরং এটি একটি ভিন্ন আপেক্ষিক সময়, যা মহাবিশ্বের সূচনা থেকে শুরু হয়েছিলো।

ফাতেমীয় মুসলিম চিন্তাবিদ আল-মুইয়াদ ফিল-দিন আল-শিরাজি ২৪ ঘন্টা, ১,০০০ বা ৫০,০০০ বছরের ৬ সৌর দিনে বিশ্ব সৃষ্টির ধারণাটিকে তিরস্কার করেন। তিনি উভয়ই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন তুলেন যে যেখানে সময় তখন তৈরিই হয়নি সেখানে কীভাবে সৃষ্টিকে সময়ের এককগুলোয় পরিমাপ করা যায়, সেইসাথে কীভাবে একজন অসীম শক্তিশালী স্রষ্টা সময়ের সীমাবদ্ধতা দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে, কারণ সময় নিজেই তার নিজের সৃষ্টির অংশ।

ইয়ুম শব্দ দ্বারা কোরানের মধ্যে বোঝানো হয় একটি দীর্ঘ সময়কাল তথা একটি যুগ বা অপরিমেয় কাল। তাই, মুসলমানরা একটি "ছয় দিনের" সৃষ্টির বর্ণনাকে ছয়টি স্বতন্ত্র সময়কাল বা যুগ হিসেবে ব্যাখ্যা করে। এই সময়কালের দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় না, অথবা প্রতিটি সময়কালে সংঘটিত নির্দিষ্ট পরিবর্তন নেই। মুস্তাফা খাত্তাব তার কুরআনের অনুবাদে লিখেছেন যে "কুরআনে শব্দটি দ্বারা সর্বদা ২৪ ঘন্টা সময়কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না। ২২:৪৭ অনুযায়ী পরকালে একটি দিন আমাদের সময়ের ১০০০ বছর। বিচারের দিন আমাদের সময়ের ৫০,০০০ বছর হবে (৭০:৪ দেখুন)। তাই, সৃষ্টির ছয় দিন বলতে ছয় যুগের সময়কে বোঝায়।"

"বিশ্রামের দিন" ধারণাটি কুরআনে অনুপস্থিত এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ক্লান্তি ফলে সৃষ্টির পরে বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো, এরূপ ধারণা একটি আয়াতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে: "আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী জিনিস সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে আর এতে আমাকে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" —কুরআন ৫০:৩৮[6]

[6]https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6

১.৫। জীবন সৃষ্টি

মানুষের সৃষ্টির আলোচনার সময় কুরআনে জীবনের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। কুরআন অনুযায়ী একক সত্তা থেকে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে, কিছু আধুনিক অনুগামীরা একে সর্বশেষ সর্বজনীন সাধারণ পূর্বপুরুষ হিসাবে বিবেচনা করে। কুরআন বলে যে প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব জৈব মাটির নির্যাস থেকে শুরু হয়। কুরআনে মানবেতর জীবন সৃষ্টির একমাত্র সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় সূরা আল-আম্বিয়া'তে, যেখানে কুরআন ঘোষণা করেছে "আমরা প্রতিটি জীবন্ত বস্তুকে পানি থেকে তৈরি করেছি"। মুহাম্মাদ আসাদের মতে, "জীবনের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র পানিতেই রয়েছে।"

১.৬। মানবজাতি সৃষ্টি

প্রথম সত্তা আদম ও তার স্ত্রী (ইসলামি ঐতিহ্যে যাকে হাওয়া বলা হয়) কুরআনে প্রথম পুরুষ ও নারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কুরআন বলে যে তাদের পানি ও পরিবর্তিত মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কথিত আছে যে এই মিশ্রণটিকে এটির বিকাশের জন্য সময় দেওয়া হয়েছিলো এবং তাদের দেহে আত্মা প্রবাহিত করার মাধ্যমে জীবিত করা হয়েছিলো, এরপর আদমকে ব্যাপক সিজদা করার ঘটনা ও ইবলিশের মতো বিশিষ্ট জ্বিনদের নির্বাসনের ঘটনা ঘটে। কিছু ইসলামি পণ্ডিত প্রস্তাব করেছিলেন যে রূপক হিসেবে আয়াতগুলোর একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কারণ কুরআন এই ধারণাটিকে সমর্থন করে যে কিছু আয়াতের একাধিক অর্থ রয়েছে।

“সে আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম, যার উপর কিতাবের মূল ভিত্তি এবং অপর কিছু আয়াত মুতাশাবিহ। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে, উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা এবং সেসব আয়াতের তাবীল খোঁজা…” —কুরআন ৩:৭

ইয়াসির ক্বাদি সহ অধিকাংশ ইসলামি পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে আদম ও হাওয়া প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহর দ্বারা একটি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিলো। জানের তাসলামান, মোহামেদ গাইলান, ইয়াশার নুরি ওজতুর্ক, আদনান ইব্রাহিম, গোলাম আহমেদ পারভেজ, এদিপ ইয়ুকসেল, এবং অন্যান্য আধুনিক ও ধ্রুপদী ইসলামি পণ্ডিতরা মাঝে মাঝে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে এই জুটি স্বাভাবিকভাবে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। কিছু পণ্ডিত বলেছেন যে তারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তারা এও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আদম ও হাওয়া শুধুমাত্র দুটি ব্যতিক্রম যারা একটি বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া ছাড়াই তৈরি হয়েছিলো।

আধুনিক সময়ে বিবর্তিত ধারণার পক্ষে মানুষের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক মুসলমান কুরআনের একটি অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে তাদের বিশ্বাসের ভিত তৈরি করেছে, যা বলে:

“তোমার প্রতিপালক বেনিয়ায, দয়াশীলও বটে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে অপসারণ করতে এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে চান আনয়ন করতে পারেন যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।” —কুরআন ৬:১৩৩

এটি প্রোটো-মানব পূর্বপুরুষদের নির্দেশ করতে পারে যেগুলো থেকে মানুষ বিবর্তিত হয়েছিলো এমনটা বিবর্তনবাদী পণ্ডিতরা দাবি করলেও, সৃষ্টিবাদী পণ্ডিতরা যুক্তি দেন যে এখানে “পূর্বসূরীগণ” হিসেবে সেই সভ্যতাগুলোকে বোঝাচ্ছে যারা মানুষের পূর্বে বসবাস করতো।

১.৭। পরিসংখ্যান

ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক দ্বারা পরিচালিত ২০০০ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯% অংশগ্রহণকারী বিশ্বাস করেন যে ইসলামের নীতিগুলো ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়, অন্যদিকে ৮১% বিশ্বাস করে যে ইসলাম ও ডারউইনবাদের মধ্যে কিছু দ্বন্দ্ব রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন ইসলামি শিক্ষক, তিনি বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন যদিও তিনি এর দ্বারা প্রস্তাবিত কিছু দিক গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। যে সমস্ত অংশগ্রহণকারী বিশ্বাস করেছিলো যে ইসলাম ও ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই তারা বিভক্ত ছিলো কেননা মাত্র ৬% অংশগ্রহণকারী প্রাইমেট ও মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত এই দাবির মধ্যে কোন সমস্যা খুঁজে পায়নি।

২০০৮ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেশিরভাগ মুসলিম দেশের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া ও মিশর সহ ১৪টি মুসলিম দেশের বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন সম্প্রতি মানব বিবর্তন সহ বিবর্তনের শিক্ষার সমর্থনে আন্তঃঅ্যাকাডেমি প্যানেল (আইএপি, বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিগুলোর একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক) দ্বারা একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে।

ম্যাকগিল গবেষক ও তাদের আন্তর্জাতিক সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত ২০০৯ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৮৫% ইন্দোনেশীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ৮৫% পাকিস্তানি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এই বিবৃতিটির সাথে একমত যে, "লক্ষ লক্ষ জীবাশ্ম দেখায় যে বিলিয়ন বছর ধরে জীবন বিদ্যমান এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে। সময়।" যাইহোক, ইন্দোনেশিয়ায়, বয়স্ক বাসিন্দাদের মধ্যে সৃষ্টিবাদ সাধারণ, এমনকি জীববিজ্ঞানের শিক্ষক ও জীববিজ্ঞান শিক্ষার অধ্যাপকদের মধ্যেও।

একটি ২০১৩ সালের পিউ সমীক্ষা অনুযায়ী, বিবর্তনকে সমর্থন করে এমন মুসলিমদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, কাজাখস্তান (৭৯%) এবং লেবাননে (৭৮%) অধিকাংশ মানুষ মানব বিবর্তনকে স্বীকার

করে, কিন্তু অন্যান্য ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে কোথাও কোথাও যেমন আফগানিস্তানে (২৬%) ও ইরাকে (২৭%) এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম।[7]

[7] *https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0*

জ্যোতির্বিদ্যা

২.১। ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ

কুরআনের সমালোচনাকারীদের অভিযোগের মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে, কুরআনে ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের প্রতিফলন হয়েছে। আগে মনে করা হতো, পৃথিবী হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র। পৃথিবী স্থির; সূর্য, চন্দ্রসহ সকল প্রকার গ্রহ-উপগ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলি এই স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে। গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীতে এ মতবাদ ভুল প্রমাণিত হয় এবং নিকোলাস কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ গৃহীত হয়।

কুরআন প্রচারের সময় সপ্তম শতাব্দীতে টলেমির ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ প্রচলিত ছিল। বাস্তব চোখেও এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য ঘোরে, এবং পৃথিবী নিজে স্থির। তাই, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থে কুরআনে চন্দ্র ও সূর্য গতিশীল এ কথা বারংবার বলা হলেও পৃথিবী যে গতিশীল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

“তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়। সূর্য তার নির্ধারিত অবস্থানের দিকে সন্তরণ করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।” (কুরআন, ৩৬ঃ ৩৭-৪০)

তবে, কুরআনের সমালোচনার বিপরীতে মুসলিম ব্যাখ্যাকার ও আধুনিক ভাষ্যকাররা উপর্যুক্ত আয়াতের ভিন্নতর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। জাকির নায়েক কিংবা আহমেদ দিদাত এবং এমন আরো প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে সমালোচকগণের বক্তব্যের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ বিষয়ক অভিযোগ খণ্ডনে মুসলিমদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়।

প্রথমত, পৃথিবী স্থির এবং সৌরজগতের কেন্দ্র, ফলে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে- এমন কথা কুরআনে সরাসরি বলা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, কুরআনে এমন অনেক আয়াত আছে, যা থেকে বোঝা যায় পৃথিবী গতিশীল। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, কুরআনে পৃথিবীর গতি নিয়ে কিছু বলা হয় নি, তবুও তা ভুল হতে পারে না। কারণ, কুরআন বিজ্ঞানের কিতাব নয় যে, এখানে সব তথ্যই পুংখানুপুংখরূপে থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, কুরআনে সূর্যের গতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু কোথাও বলা হয় নি পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য গতিশীল।

চতুর্থত, কুরআনে সূর্যের জন্য একটি নির্ধারিত গন্তব্যস্থানের কথা বলা হয়েছে। বুকাইলি বলেন, এ ধারণা বিজ্ঞান বিরোধী হতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানেও স্বীকার করা হয়েছে, আমাদের সূর্য তার পুরো সৌরজগত সহ একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এ গন্তব্যস্থানের নামও বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই দিয়েও ফেলেছেন, Solar Apex বা সৌরশীর্ষ।[8]

[8]*https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE*

২.২। মহাকাশবিজ্ঞান

“কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, একসময় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম এবং জীবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা অবিশ্বাস করবে?” (সূরা আম্বিয়া, আয়াতঃ ৩০)।

“তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী; তিনি যখন কিছু করতে চান তখন সেটিকে বলেন:’হও’, অমনি তা হয়ে যায়।” (সূরা ইমরান, আয়াতঃ ১১৭)।

এই আয়াতদ্বয় দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাধারণ তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী একসময় মহাবিশ্বের সকল বস্তু আড়ষ্ট অবস্থায় ছিল, একটি বিন্দুতে। অতঃপর বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা আলাদা হয়ে গেছে। অন্যদিকে; আধুনিককালের বিজ্ঞানীদের মতে; জীবনের উৎস হলো পানি। তাছাড়া সমস্ত জীবদেহের ৮০-৮৫% -ই পানি দিয়ে গঠিত।

“অতঃপর তিনি পৃথিবীর দিকে মনোনিবেশ করেন;যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ।” (সূরা ফুসসিলাত, আয়াতঃ ১১)।

এখানে ধুম্রপুঞ্জ বলতে পৃথিবীর আদি অবস্থার কথা বলা হয়েছে।‘ধুম্র’ শব্দের অর্থ-ধোয়া বা গ্যাস। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবী একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত, জ্বলন্ত ও গ্যাসের পিণ্ড ছিল।

“তিনিই সূর্যকে তেজস্বী করেছেন এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার তিথি নির্দিষ্ট করেছেন।” (সূরা ইউনূস, আয়াতঃ ৫)।

“কত মহান তিনি; যিনি সৃষ্টি করেছেন সৌরজগৎ এবং উহাতে স্থাপন করেছেন সূর্যকে প্রদীপরূপে এবং চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময়!” (সূরা ফুরকান)

কুরআনে সূর্যকে ‘সিরাজ’ (প্রদীপ) বলা হয়েছে; যা নিজেই আলো উৎপন্ন করতে সক্ষম। চাঁদের আলোকে কুরআনে ‘মুনীর’ বলা হয়েছে। আরবীতে ‘মুনীর‘ অর্থ অন্য উৎস থেকে গৃহীত আলো বা প্রতিফলিত আলো’।

“চন্দ্র ও সূর্য হিসাবমত ঘোরে।” (সূরা রহমান, আয়াতঃ ৫)

মহাকাশবিজ্ঞান অনুযায়ী চাঁদ ২৮ দিন ১২ ঘণ্টায় সমগ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য নিজের অক্ষে নিজস্ব গতিতে ঘূর্ণায়মান। সূর্য প্রায় ২৫ দিনে একটি আবর্তন সম্পন্ন করে। তবে পৃথিবীর সাপেক্ষে সূর্যের অবস্থান প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকায় আমরা এই আবর্তন বেগের মান পাই ২৮ পার্থিব দিন। দেখা যাচ্ছে,সূর্যের নিজ কক্ষের চারদিকে আবর্তন বেগ খুবই কম, এই ঘূর্ণন বেগ থেকে যে কেন্দ্রাতিগ বলের সৃষ্টি হয় তা সূর্যের পৃষ্ঠ অভিকর্ষের তুলনায় ১৮০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

“আমি আমার অসীম ক্ষমতাবলে নির্মাণ করেছি মহাসম্প্রসারণশীল মহাকাশ।” (সূরা যারিয়াত, আয়াতঃ ৪৭)।

বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক যুগে রুশ পদার্থবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান ও বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জর্জেস লেমেট্রে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে জানান যে মহাকাশ সম্প্রসারণশীল, প্রতিনিয়তই এটি সম্প্রসারিত হচ্ছে।[9]

[9] *https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%93_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8*

২.৩। সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

“অবশেষে তিনি (যুলকারনাইন) যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌছলেন......” (কুরআন, ১৮ঃ৮৬)

“অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন.....”. (কুরআন, ১৮ঃ৯০)

কোনো কোনো মুসলিম পন্ডিতের মতে, অস্তাচলের অর্থ হলো জুলকারনাইন পশ্চিম দিকে দেশের পর দেশ জয় করতে করতে স্থলভাগের শেষ সীমানায় পৌঁছে যান, এরপর ছিল সমুদ্র।

“অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।” (কুরআন, ১৮ঃ৯০)

মুসলিম ব্যাখ্যাকারগণ উপর্যুক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর আভিধানিক ও ব্যাকরণগত বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে অভিযোগ খণ্ডন করে থাকেন।

এখানে ‘সূর্যের অস্তাচল’ অনুবাদটি করা হয়েছে আরবি 'মাগরিব' শব্দ থেকে। ‘মাগরিব’ শব্দটি দ্বারা পশ্চিম দিক (পাশ্চাত্য) বুঝানো হয়। অন্যদিকে, সূর্যের উদয়াচল শব্দটি আরবি 'মাতলিয়াউস শামস' এর অনুবাদে করা হয়েছে, যার পরোক্ষ উদ্দেশ্য পূর্বদিক (প্রাচ্য) বুঝানো। মূলত, জুলকারনাইন ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ, পরাক্রমশালী, ভুবনজয়ী সম্রাট। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব দিক জয় করে ফেলেছিলেন। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সব ছিল তার ক্ষমতার অধীন। এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে।

মূলত, ভাষাগতভাবে বোঝা ও বোঝানোর সুবিধার্থে 'উদয়াচল' ও 'অস্তাচল' শব্দগুলো প্রায় ভাষাতেই প্রচলিত। আমরা যখন বলি, 'সূর্যোদয়ের দেশ জাপান', তখন কিন্তু এটা

বোঝানো হয় না, যে জাপানের ভূখণ্ড চিরে সূর্যোদয় ঘটে। বরং এ কথার অর্থ এই যে, জাপান পৃথিবীর পূর্বভাগে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

জাকির নায়েকের মতে, ব্যাকরণগতভাবে, এই আয়াত দুটোতে সূর্যের উদয় ও অস্ত সম্বন্ধে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছে, তা ইসমে যরফ (স্থান বা সময়বাচক বিশেষ্য) এর শব্দ। ফলে সূর্যের অস্তাচল বলতে 'মাগরিব' নামে যে আরবি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ যেমন বৈয়াকরণিকভাবে 'সূর্য অস্ত গমনের স্থান বা অস্তাচল' হতে পারে তেমনি, 'সূর্য অস্ত গমনের সময় তথা সান্ধ্যকাল' বোঝাতেও পারে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই 'মাগরিবের নামায' বলে যে নামায প্রচলিত আছে, তা দ্বারা সূর্যের অস্তাচলের নামায বোঝানো হয় না, বরং সান্ধ্যকালীন নামায বোঝায়।

তাই, উপর্যুক্ত আয়াত দুটোতে ব্যবহৃত 'মাগরিব' ও 'মাতলিয়া' এর অর্থ হতে পারে, 'সূর্যাস্তের সময়' এবং 'সূর্যোদয়ের সময়'।

২.৪। পঙ্কিল জলাশয়ে সূর্যের অস্তগমন

ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার 'কুরআন ও বাইবেলঃ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে' বইতে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআনে বলা হয়েছে যে, 'সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায়।' তিনি দলিল হিসেবে কুরআনের সূরা কাহাফের উদ্ধৃতিটি তুলে ধরেনঃ

"অবশেষে তিনি যখন সুর্য অস্তমিত হবার সময়ে উপনীত হলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।" (কুরআন, ১৮ঃ৮৬)

উপরের আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূর্য পংকিল জলাশয়ে অস্ত যায় বলা হয়েছে। কোন বৃহৎ জলাশয় যেমন নদী বা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত অবলোকন করলে মনে হয় সূর্য পংকিল জলাশয়ে ডুবে যাচ্ছে। উইলিয়াম ক্যাম্পবেল অভিযোগ করেন, মুহাম্মাদ তার বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তা-ই কুরআনে লিখে রেখেছেন। অথচ, পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং পৃথিবী সূর্য অপেক্ষা প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। তাই, সূর্য পংকিল জলাশয়ে অস্ত যায়, এরকম ত্রুটিপূর্ণ বক্তব্য কুরআনের ঐশ্বরিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ইসলামপন্থী যুক্তিবিদদের দ্বারা উপর্যুক্ত অভিযোগ খণ্ডিত হয়েছে। জাকির নায়েক অভিযোগের জবাবে বলেন, কুরআন বলে নি যে, সূর্য পংকিল জলাশয়ে অস্ত যায়। বরং কুরআন কেবল বলেছে যে, জুলকারনাইন নামের ব্যক্তিটি কী দেখেছেন, জুলকারনাইনের কাছে কী অনুভূত হয়েছে। আয়াতটিতে আরবিতে 'ওয়াজাদা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা Verb of Perception বা অনুভূতিসূচক ক্রিয়াপদ হিসেবে পরিচিত। জুলকারনাইন যখন কোন এক পংকিল জলাশয়ের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন, তখন তিনি সূর্যাস্ত অবলোকন করলেন আর দেখতে পেলেন যে, সূর্য যেন ঐ জলাশয়টিতে ডুবে যাচ্ছে। কুরআন একথা বলছে না যে, সূর্য প্রকৃতই জলাশয়ে ডুবে যায়, বরং কুরআন কেবল যুলকারনাইনের সূর্যাস্ত দর্শনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে তার দৃষ্টিতে কী গোচরীভূত হয়েছে, তা বর্ণনা করছে।

২.৫। নক্ষত্রের পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, পৃথিবীর ভূত্বক ও ভূগর্ভের উপাদান মৌলগুলো বিভিন্ন নক্ষত্রের অভ্যন্তরে নিউক্লীয়-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর কালের ব্যবধানে, সেই সব নক্ষত্র যখন সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হয়, তখন নক্ষত্রগুলো থেকে বিভিন্ন মৌল ও উপাদান ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং তা থেকেই পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ-গ্রহাণুপুঞ্জ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। তাই, আমরা বলতে পারি, পৃথিবী ও নক্ষত্রাদির আদি উৎস সৃষ্টি সমসাময়িক ঘটনা, আর নক্ষত্রের বিস্ফোরণের পর পৃথিবীর সৃষ্টি অর্থাৎ পৃথিবী নক্ষত্রের পরে সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে কুরআনে বলা হয়েছে যে, নক্ষত্রের পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (কুরআন, ৪১:১১-১২)

উপর্যুক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কুরআনের ভাষ্যকারগণ বলেন যে, সমালোচনার আয়াতটিতে কোথাও বলা হয় নি যে, পৃথিবী নক্ষত্রের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। বরং এ কথা বলা হয়েছে। আকাশ ও পৃথিবী আগে থেকেই সৃষ্টি করা ছিল, এবং সেই আকাশে বিভিন্ন নক্ষত্র সৃষ্টি করা হয়েছিল। পৃথিবীকে স্থিতকরণের পাশাপাশি সাত (বহু) আকাশ সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এ বর্ণনা বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় মুসলিম ভাষ্যকারগণ উপসংহার টানার চেষ্টা করেছেন।

২.৬। আকাশের সংখ্যা

বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের এই বিশ্বজগতে কোটি কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে এবং প্রত্যেক গ্যালাক্সিতে অসংখ্য তারকা, নক্ষত্র রয়েছে। কিন্তু কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় আকাশের সংখ্যা বলা হয়েছে সাত।

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ কীভাবে আসমানকে স্তরে স্তরে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেছেন?" (কুরআন, ৭১ঃ১৫)

মরিস বুকাইলি তার বইতে মন্তব্য করেছেন, সম্ভবত 'সাত' সংখ্যা দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় 'অগণিত', 'বহু', 'অনেক' ইত্যাদি বুঝানো হয়। আরবি ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। বুকাইলির মতে, 'সাত আকাশ' দ্বারা কুরআনে 'বহু সংখ্যক আকাশ' বুঝানো হতে পারে।

কুরআনের অন্যত্রও এমন অর্থ প্রকাশ পেয়েছেঃ
"......... আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না।" (কুরআন)

উপরের আয়াতে বলা হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ যদি মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সত্তরবারও ক্ষমা চান, তবুও মুনাফিকদের পাপ রাশি মাফ করা হবে না। এর অর্থ এই নয় যে, নবী মুহাম্মাদ যদি একাত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। বরং, আয়াতে 'সত্তর বার' বলতে 'অসংখ্য বার' অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে।

২.৭। নিম্নতম আকাশে নক্ষত্ররাজির অবস্থান

বিশ্বজগতে রয়েছে অসংখ্য গ্যালাক্সি এবং প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে শত কোটি তারকা, নক্ষত্র। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে, নিকটবর্তী আসমান বা দুনিয়ার আসমানকেই কেবল প্রদীপমালা তথা তারকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।

"আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" (কুরআন, ৪১:১২)

'আসমান' বলতে কুরআন যদি গ্যালাক্সি বুঝিয়ে থাকে, তবে উপরের আয়াতটির অর্থ, যে আসমান আমাদের দুনিয়া থেকে দেখা যায়, সেই আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ, কেবল আমাদের ছায়াপথেই কেবল নক্ষত্র ও তারকারাজি আছে, অন্যান্য গ্যালাক্সিতে কোন তারকা নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এমন তথ্য নিতান্তই অসংগতিপূর্ণ।

কুরআনের সমালোচকদের এই সমালোচনার জবাবে মুসলিম ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, নিকটবর্তী আসমান ছাড়া অন্য কোন আসমানে তারকা বা নক্ষত্র নেই, এমন দাবি কুরআনের কোথাও করা হয় নি। আসমান বলতে গ্যালাক্সি বুঝায় এমনটাও বলা হয়নি।

২.৮। সূর্য ও চন্দ্রের আলো

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে করেছেন তেজস্ময়; আর তিনি চন্দ্রকে করেছেন জ্যোতির্ময়, এর জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনজিল (রাশি) যাতে করে তোমরা বর্ষ সংখ্যা জানতে পারো এবং তা গণনা করতে পারো।” (কুরআন, ১০ঃ৫)

“আর চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোক রূপে আর সূর্যকে প্রদীপরূপে।” (কুরআন, ৭১ঃ১৬)

কুরআনের ভাষ্যকারগণ দাবি করেন, কুরআনে সূর্য ও চন্দ্রের আলোর প্রকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানবিরোধী কোন বক্তব্য নেই, বরং এ বিষয়ে চমকপ্রদ তথ্য বর্ণিত আছে, যা সপ্তম শতকের কোন গ্রন্থের কাছ থেকে জানতে পারাটা অলৌকিক বিষয়।

কুরআনে সূর্যকে 'প্রদীপ' হিসেবে উপমিত করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। একথা সর্বজন বিদিত যে, প্রদীপ একটি ভাস্বর বস্তু, যার নিজস্ব আলো থাকে। সূর্যকে বারংবার 'প্রদীপ' হিসেবে উপমিত করার অর্থঃ সূর্য আলোর প্রকৃত উৎস এবং এটি প্রদীপের মত একটি ভাস্বর বস্তু, যা নিজেই আলো বিকিরণ করে।

অন্যদিকে, পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চন্দ্র আলোর গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করে। পৃথিবীর মানুষজন ও পশুপাখি রাতের বেলায় চাঁদের আলোর উপর নির্ভর করে। মুসলিম ভাষ্যকারগণ বলেন যে, আলোর পরোক্ষ উৎস বা গৌণ উৎস হিসেবে চন্দ্রের ভূমিকা রয়েছে, তা সত্ত্বেও, কুরআন কোথাও চন্দ্রকে 'আলোর উৎস' হিসেবে ঘোষণা দেয় নি।

কুরআনে সূর্যের আলো বোঝাতে 'দিয়াউন' 'ওয়াহাজ' প্রভৃতি শব্দ নির্দেশিত হয়েছে, যাদের অর্থ 'তেজস্ময় রশ্মি', 'জ্বলন্ত প্রভা'। এই শব্দগুলো যথার্থই সূর্যের আলোর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে, চাঁদের আলো বোঝাতে আরবিতে 'নূর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ প্রতিফলিত আলো, আলো, উজ্জ্বল আলো ইত্যাদি। চন্দ্রের আলোর প্রকৃতির চরিত্র বর্ণনায় এ শব্দটিও যথার্থ।

কুরআনে সূর্য ও চন্দ্র এবং এদের আলো নির্দেশ করতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শব্দ ও উপমা ব্যবহার করেছে। সূর্যকে বোঝাতে 'প্রদীপ' (যা নিজে থেকে আলো বিকিরণ করে) উপমাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও চন্দ্রের ক্ষেত্রে কখনোই এই উপমাটি ব্যবহার করা হয় নি। অন্যদিকে, সূর্যের আলোর প্রকৃতি বোঝাতে 'দিয়াউন', 'ওয়াহাজুন' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করলেও চাঁদের আলো বোঝাতে যে 'নূর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেই 'নূর' শব্দটি কখনোই সূর্যের আলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে নি। এ থেকে বোঝা যায়, কুরআন সচেতনভাবেই শব্দগত পার্থক্যের মধ্য দিয়ে সূর্য ও চন্দ্রের আলোর প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দেশ করেছে। মরিস বুকাইলি, সূর্য ও চন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত উপমা এবং এদের আলোর স্বরূপ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত শব্দের ভিন্নতা সচেতনভাবে কুরআন পাঠক সমীপে তুলে ধরায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং কুরআনকে ঐশীগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

প্রখ্যাত আলোকশাস্ত্র বিজ্ঞানী আল-হাসান (আল-হ্যাজেন নামে সমধিক পরিচিত) কর্তৃক ১৫৭২ সালে প্রকাশিত 'কিতাব-আল-মানাযির' (আলোকবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তক) এ জানিয়েছেন, আরবি 'দিয়াউন' দ্বারা 'আবশ্যকীয় মৌলিক আলো' বোঝানো হয়; অন্যদিকে, 'নূর' দ্বারা 'অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম আলো' বোঝানো হয়। আর আরবি অভিধান মতে, সূর্যের আলোকে 'দিয়াউন' বলা হয়, আর চন্দ্রের আলোকে 'নূর' বলা হয়। মুসলিমগণ বলেন, কুরআন সূর্যের আলোকে 'দিয়াউন' আর চন্দ্রের আলোকে সর্বদা 'নূর' বলে অভিহিত করণের মাধ্যমে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে ও বিস্ময়কর ভাবে নির্দেশ করেছে যে, সূর্যের আলো এর নিজস্ব আলো, অন্যদিকে, চন্দ্রের আলো কৃত্রিম আলো।

২.৯। চন্দ্র বিদারণ

চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ। সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবী সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে ঘূর্ণায়মান থাকায় এর একটি অংশ ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং মহাকর্ষ নিয়মানুযায়ী পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করতে থাকে। এ আবর্তন কোটি কোটি বছর যাবৎ চলে আসছে, এতে কোন বিঘ্ন ঘটে নি।

"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।" (কুরআন, ৫৪ঃ১)

যদি সপ্তম শতকে চাঁদ বিদীর্ণ হবার কোন ঘটনা ঘটত, তবে এ ঘটনার সাক্ষী পুরো বিশ্ব প্রত্যক্ষ করত। ঐতিহাসিকভাবে এ ঘটনার দলিল থাকত। কিন্তু এ ধরনের কোন দলিল প্রমাণ বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায় না। জ্যোতির্বিদ্যার সাধারণ নীতি অনুযায়ীও এ ধরনের ঘটনা অস্বাভাবিক।

সমস্যার সমাধানে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, চন্দ্রের বিদারণ কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল নবী মুহাম্মাদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনা। সাধারণ অভিজ্ঞতা, নীতি, তত্ত্ব দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনাই ব্যাখ্যা করা যায় না। জাকির নায়েকের মতে, যেহেতু ঘটনাটি অতীতে সংঘটিত একটি অস্বাভাবিক ঘটনা তা-ই ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভবপর নয়। তবে, কোন গ্রহ বা উপগ্রহে ফাটল সৃষ্টি হওয়া এবং পরে তা জোড়া লেগে ঠিক হয়ে যাওয়া জ্যোতির্বিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী, অস্বাভাবিক হলেও কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এধরনের ঘটনার সম্ভাব্যতাও নাকচ করেন নি। তাই, কুরআনের চন্দ্র বিদীর্ণ হবার দাবি অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রের অভাবে এ ঘটনাকে মিথ্যে সাব্যস্ত করা অসমীচীন বলে মনে করেন মুসলিম মনীষীগণ।

ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতা তুলে ধরে ইসলামি চিন্তাবিদগণ বলেন, যখন মক্কায় চন্দ্র বিদারণের ঘটনাটি ঘটে, তখন স্থানীয় সময় ছিল রাত। বিশ্বের সর্বত্র একই সময় রাত থাকে না বলে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডনের ঘটনা পুরো বিশ্ব কর্তৃক পর্যবেক্ষিত হওয়া সপ্তম শতকের মত সময়ে সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া বিশ্বের যেসব জায়গায় রাত ছিল, সেখানকার সবাই-ই এ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে, বিষয়টা তা-ও না। কারণ, ভূ-পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট স্থান থেকে

নির্দিষ্ট কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারার বিষয়টি বীক্ষণ কোণের উপর নির্ভর করে। বর্তমান বিশ্বেও চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হলে, বিশ্বের তাবৎ মানুষ সেই ঘটনা একই সাথে পর্যবেক্ষণ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ঘটনাটি বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সভ্যতার মানুষদের দ্বারা পর্যবেক্ষিত হলেও তা লিপিবদ্ধ হবার সম্ভাবনা কম। কেননা, তৎকালীন যুগের বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস ও উল্লেখযোগ্য সব ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের কেরালা অঞ্চলের মালাবার প্রদেশের রাজা চক্রবর্তী ফারমা সপ্তম শতকে চন্দ্র বিদারণের এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে লন্ডনকেন্দ্রিক ভারতীয় কার্যালয় পাঠাগারের এক নথিতে পাওয়া যায়। [তথ্যসূত্র প্রয়োজন] বর্ণিত আছে যে, উক্ত বিস্ময়কর ঘটনা পর্যবেক্ষণপূর্বক রাজা চক্রবর্তী স্বীয় পুত্রকে রাজ দায়িত্ব অর্পণ করে আরবদেশে নিজে গমণ করেন। [তথ্যসূত্র প্রয়োজন] মালাবার রাজা আরবদেশে যান, নবী মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাৎকারপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিজ দেশে যাত্রা শুরু করেন। [তথ্যসূত্র প্রয়োজন] পথিমধ্যে তার অকস্মাৎ মৃত্যু হয় এবং ইয়েমেন এর বন্দর নগরী জাফরে তাকে সমাহিত করা হয়। [তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

ভারতবর্ষের রাজার সাথে নবী মুহাম্মাদের সাক্ষাতের ঘটনা ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় ধর্মশাস্ত্র হাদিসে এসেছে।

এরূপ বিভিন্ন তথ্যাদি পেশ করে, মুসলিম বিশারদগণ চন্দ্র বিদারণের একটি ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস করেন। তবে, সমালোচকগণ পুনরায় এরূপ জবাবের সমালোচনা পেশ করে বলেছেন যে, উপর্যুক্ত দলিলাদি নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। অত্যন্ত নড়বড়ে দলিলাদি দ্বারা এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। তাছাড়া, সমালোচকগণ বলেন, ইসলামেও দুর্বল তথ্যসূত্র দ্বারা বর্ণিত কোন বিবৃতি হাদিস বলে স্বীকার হয় না।[10]

[10] *মুল নিবন্ধ: চন্দ্র বিভাজন*
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE

২.১০। মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়কাল

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, এই মহাবিশ্ব, আমাদের সৌরজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি কোটি কোটি বছর সময়কাল যাবৎ পর সৃষ্টি হয়েছে। অথচ, কুরআনে বলা হয়েছে, মহাকাশ ও পৃথিবী মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ধারণা কুরআন নাজিলের সমসাময়িক যুগে প্রচলিত ছিল। ফলত, তৎকালীন যুগে প্রচলিত এ ভুল ধারণাই কুরআনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

“আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।” (কুরআন, ৫০:৩৮)

বিজ্ঞানীদের মতে, ২৪ ঘণ্টার ছয় দিনে এই মহাবিশ্ব মোটেও সৃষ্টি হয় নি। বরং তা কোটি কোটি বছর যাবৎকালের জটিল ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে।

কুরআনের কোন কোন ব্যাখ্যাকার এখানে ব্যবহৃত 'আইয়াম' শব্দের অর্থ করে থাকেন 'সময়কাল', ২৪ ঘণ্টার দিন নয়। অথচ, কুরআনের যেসব জায়গায় 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় আইয়াম সময় লেগেছে' এমন তথ্য আছে, কেবল সে সব জায়গায় তারা 'আইয়াম' শব্দের অর্থ করে থাকেন 'সময়কাল'। আর বাকি যত জায়গায় সাধারণ 'ইয়াওম' বা 'আইয়াম' শব্দটি এসেছে, তার সবক্ষেত্রেই এর অর্থ করে থাকেন 'দিন'। অনুবাদের এ রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পার্থক্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ড মরিস বুকাইলি তার বিখ্যাত 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' বইতে উপর্যুক্ত বিষয়টি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আরবিতে 'দিন' বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- তা হচ্ছে, 'আইয়্যাম'। 'আইয়াম' শব্দটি আরবি 'ইয়াওম' শব্দের বহুবচন।

'ইয়াওম' শব্দের অর্থ 'দিন'। এটি হতে পারে ২৪ ঘণ্টার একেকটি দিন, আবার হতে পারে ২৪ ঘণ্টার চেয়ে বেশি দীর্ঘ বা সুদীর্ঘ সময়। 'ইয়াওম' এর বহুবচন হিসেবে 'আইয়াম' এর অর্থ দাঁড়ায়, প'দিনসমূহ', যা কমপক্ষে তিন দিন থেকে শুরু করে সুদীর্ঘকালের সমষ্টি হতে পারে। 'আইয়াম' শব্দের অর্থঃ যুগ হিসেবেও ব্যাপক প্রচলিত। যেমনঃ বলা হয়, 'আইয়ামে

জাহিলিয়্যাহ' তথা 'অজ্ঞতার যুগ'। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, 'আইয়াম' শব্দটি আরবিতে সুদীর্ঘসময় নির্দেশ করে।

আর মহাবিশ্ব ও পৃথিবী ছয়টি সুদীর্ঘ সময়ের মেয়াদে সৃষ্টি হয়েছে- এমন মন্তব্য বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে না।

কুরআনে দিন শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'দিন' শব্দটি সময়ের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যকে নির্দেশ করে বিভিন্ন আয়াত উপস্থাপিত হয়েছে।

২.১১। সাত পৃথিবী

কুরআন বিভিন্ন জায়গায় সাত আকাশের দাবি করার পাশাপাশি এক স্থানে এটিও দাবি করেছে যে, আমাদের পৃথিবীর মতো মোট ৭ টি পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সমালোচকগণের দ্বারা এই আয়াত বৈজ্ঞানিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

"আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত।" (কুরআন, ৬৫ঃ১২)

পৃথিবীর সংখ্যা সাত এর ব্যাখ্যাস্বরূপ মুসলিম ভাষ্যকারগণ বলেন, আমাদের পৃথিবীর মত হয়তো মোট সাতটি গ্রহ আছে, যার পরিবেশ-প্রতিবেশ ঠিক পৃথিবীর মতোই এবং সেখানেও পৃথিবীর মতই প্রাণ আছে। বিজ্ঞান এমন বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ করতে না পারলেও একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নি। বরং, বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে পৃথিবীর বাইরে প্রাণির অস্তিত্ব নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন গবেষণা বিজ্ঞানিদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে, আমাদের পৃথিবীর বাইরেও মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। কেবল প্রাণের অস্তিত্বই নয়, বরং বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, মহাবিশ্বে মানুষের মতই আরো বিচিত্র ধরনের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণির অস্তিত্ব আছে।

কুরআনের যে আয়াতটি নিয়ে অভিযোগ পেশ করা হয়েছে, সে আয়াতটি থেকেও এমন ধারণা পাওয়া অমূলক নয় যে, পৃথিবী সদৃশ অন্যান্য গ্রহগুলোতেও প্রাণের অস্তিত্ব আছে এবং বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আয়াতটি সংকেত দিচ্ছে, কারণ, কুরআন বলছে যে, ঐসব গ্রহেও আল্লাহর আদেশ জারি হয়। এথেকে বুঝা যায়, ঐসব গ্রহে প্রাণ এবং বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

২.১২। ছায়ার অবস্থান পরিবর্তন

“তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কীভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।” (কুরআন, ২৫ঃ৪৫)

ড ক্যাম্পবেল বলেন, যদি কুরআন এই দাবিই করে যে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীসহ সব গ্রহ ঘোরে; তাহলে, কুরআনের বলা উচিৎ ছিল যে, 'আমি পৃথিবীকে করেছি ছায়ার নির্দেশক।

ড নায়েক এর মতে, আলোচ্য আয়াতে কোথাও বলা হয় নি, ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে সূর্যের আবর্তনের কারণে।

পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া যে সূর্যের কারণে সৃষ্টি হয়, এটি সাধারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। ছায়া সৃষ্টি হয় আলোক উৎসের সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধক থাকার কারণে। আর এই আলোক উৎস এক্ষেত্রে সূর্য। তাই, সূর্যই হচ্ছে ছায়ার নির্দেশক- বক্তব্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যথাযথ।

২.১৩। আকাশ মাথার উপর ভেঙে পড়া

বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে কুরআনের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল, কুরআন আকাশকে কঠিন বস্তু বলে মনে করেছে। এবং তাই একে ছাদ হিসেবে উপমিত করেছে। অন্যদিকে, ছাদের কিয়দংশ যেমন ভেঙে পড়তে পারে, তেমনই কুরআনও দাবি করেছে যে, আকাশ বা এর অংশবিশেষ ভেঙে পড়তে পারে।

"তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (সুরা সা'বা ৩৪:৯)

মুসলিম ভাষ্যকারগণের মতে, উপরের আয়াতে 'আকাশের কোন খণ্ড বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা আরবি 'কিসাফাম মিনাস সামায়ী' এর অনুবাদ। মূল আয়াতে 'মিন' নামে যে অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, 'থেকে', 'হতে', 'পক্ষ থেকে'। তাই, 'কিসাফাম মিনাস সামাই' বাক্যাংশের অর্থ 'আকাশ হতে কোন বস্তু খণ্ড'।

মহাকাশে পৃথিবীর বাইরে বিভিন্ন বস্তুখণ্ড, গ্রহাণু ইত্যাদি ঘূর্ণায়মান। যেকোন সময় এগুলোর কোনটি পৃথিবীতে আঘাত হানলে, পৃথিবীর ভারসাম্য চরমভাবে ব্যহত হতে পারে। ইসলামি ব্যাখ্যাকারগণ তাই বলেন, মহান আল্লাহ্ উপর্যুক্ত আয়াতে এটিই বলেছেন যে, অহংকারকারী অবিশ্বাসী, পাপাচারীদের উপর আল্লাহ্ আকাশস্থিত কোন বস্তু খণ্ড ফেলতে পারেন, তাই, তারা যেন দর্প না করে।

২.১৪। নক্ষত্র শয়তানের প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র

“নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ওরা ঊর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।” (কুরআন, ৩৭ঃ ৬-১০)

“আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।” (কুরআন, ৬৭ঃ৫)

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে, এছাড়াও প্রদীপ বলতে নক্ষত্রও বোঝানো হয়। তাই, শেষোক্ত আয়াতের অর্থ, শয়তান দের জন্য বিভিন্ন সময় নক্ষত্রকে ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে নিক্ষেপ করা হয়।

উপর্যুক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইসলামের ধ্রুপদি পণ্ডিতগণও তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। আধুনিক জ্যোতির্শাস্ত্রবিদ্যায় 'নাজম' বলতে তারকা বা নক্ষত্র, 'কাওকাব' বলতে 'গ্রহ', 'শিহাব' বলতে 'জ্বলন্ত বস্তু' বুঝানো হয়। কিন্তু সাধারণ আরবি ভাষীগণ শব্দগুলোকে ঠিক ঠিক এই অর্থেই সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করেন না। কুরআন অবতরণে সময় তো শব্দগুলোর অর্থ আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার পরিভাষা হিসেবে কখনোই সুনির্দিষ্ট বা সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হতো না। বরং উল্লেখিত শব্দগুলোর অর্থ 'আম', যা ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক।

সাধারণ আরবি ভাষায় 'কাওকাব' বলতে যে কোন ধরনের জ্যোতিষ্ককে বোঝানো হয়। তাই, উল্কাপিণ্ড এক প্রকারের কাওকাব। এমনকি সে অর্থে তারকা বা নক্ষত্রও এক প্রকারের 'কাওকাব'। আর, 'নাজম' শব্দটির অর্থও তা-ই। বিভিন্ন ধরনের জ্যোতিষ্ক বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার প্রাচীন ও বর্তমান আরবি ভাষীদের মধ্যে দেখা যায়। এ অর্থে 'নাজম' শব্দটি অর্থও হতে পারে 'উল্কাপিণ্ড'। তাই, ঊর্ধ্বজগত থেকে যে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড

বা উল্কাপিণ্ড কিংবা ধূমকেতু পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পতিত হয়, তাকে আরবি ভাষায় 'শিহাব', 'নাজম' বা 'কাওকাব' যে কোন শব্দ ব্যবহার করে জানানো যেতে পারে।

তাই, বিদ্রোহী শয়তানকে 'নাজম' নিক্ষেপে ধাওয়া করা হয়, কুরআন একথা বলার অর্থ এটা নয় যে, কুরআন বলছে কোন নক্ষত্রকে শয়তানের পেছনে ছুড়ে মারা হয়েছে।

এভাবে, ইসলাম ধর্ম বিশারদগণ উপসংহার টানেন যে, আলোচ্য আয়াতগুলোতে 'নাজম' দ্বারা নক্ষত্র বোঝানো হয় নি, বরং জ্বলন্ত কোন জ্যোতিষ্ক তথা উল্কা বোঝানো হয়েছে। হাদিস শাস্ত্রেও নবী মুহাম্মাদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, শয়তানের প্রতি ঊর্ধ্বজগতে যে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়, তা উল্কা।[11]

---

[11] *https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE*

জীববিদ্যা

৩.১। কুরআনে ভ্রূণবিদ্যা

শুক্র নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষ-পিঞ্জরের মধ্য থেকে

পুরুষের বীর্য উৎপন্ন হয় অণ্ডকোষে আর অণ্ডকোষ থেকে তা বের হবার পথ মূত্রথলির পিছনভাগ ও নিচ থেকে। বীর্যের উৎপাদন বা পরিক্রমণের পথ কোনটিই মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্যবর্তী কোন স্থান নয়। কুরআনের পর্যালোচকগণ দাবি করেন, কুরআনে এমন একটি অবৈজ্ঞানিক কথাই লিপিবদ্ধ আছে।

“অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে।সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।” (৮৬ঃ ৫-৭)

কুরআন সবেগে স্থলিত তরল সম্বন্ধে যা বলেছে, তার বৈজ্ঞানিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে ইসলাম বিশারদগণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। অভিযোগ খণ্ডনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর দেওয়া জবাবের ভিন্নতা ব্যাপক দ্ব্যর্থবোধকতার সৃষ্টি করেছে।অনেকগুলো মতের মধ্য থেকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতটি হলো, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অন্ডকোষে বীর্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত রক্ত ও স্নায়ুর সংযোগ। অন্ডকোষের রক্ত সন্চালন হয় Testicular Artery নামক রক্ত নালীকা দ্বারা যা লাম্বার লেভেল থেকে তৈরী হয় যা মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্যবর্তী একটি স্থান। ঠিক একই ভাবে অন্ডকোষের স্নায়ুর সংযোগ আসে Paraaortic ganglia থেকে যা অবস্থান করে মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে।[12]

---

[12] *https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE*

ভ্রূণতত্ত্ব

“আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে একটি নতুনরূপে দাড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টি কর্তা কতই না কল্যাণময়।” (সূরা মু’মিনুন: ১২-১৪)

আরবী ” اَلْعَلَقَةُ” (আলাকা) শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে।

১. জোঁক

২. সংযুক্ত জিনিস

৩. রক্তপিন্ড

আমরা যদি জোককে গর্ভস্থ সন্তানের সাথে মেলাতে যাই তাহলে,আমরা দু’টির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। নিচের ১ নং ছবিতে সেটা স্পষ্ট। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি-মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮) এ অবস্থায় জোক যেমন অন্যের রক্ত খায় তেমনি উক্ত ভ্রুন তার মায়ের রক্ত খেয়ে বেচে থাকে। (কুরআন-হাদীসের আলোকে মানব দেহের প্রবৃদ্ধি –মুর ও অন্যান্য পৃষ্ঠা-৩৬)

দ্বিতীয় অর্থের আলোকে আমরা যদি তাকে “সংযুক্ত জিনিস” অর্থে নিই তাহলে দেখতে পাই যে,গর্ভস্থ ভ্রুন মায়ের গর্ভের সাথে লেপ্টে আছে।

তৃতীয় অর্থের আলোকে আমরা উক্ত শব্দের “রক্তপিন্ড” অর্থ গ্রহণ করলে দেখতে পাব যে, তার বাহ্যিক অবস্থা ও তার সংরক্ষিত খাচা (আবরণ) রক্ত পিন্ডের মতই দেখায়। উক্ত অবস্থায় এখানে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বর্তমান থাকে।(কুরআন-হাদীসের আলোকে মানব দেহের প্রবৃদ্ধি –মুর ও অন্যান্য পৃষ্ঠা-৩৭ ও ৩৮)

এতদসত্বেও তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এই রক্ত সঞ্চালিত হয় না। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি-মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ,পৃষ্ঠা-৬৫) সুতরাং, বলা যায়- এ অবস্থা রক্তপিন্ডের মতই।
উক্ত “আলাকা” শব্দের তিনটি অর্থের সাথেই ভ্রুনের বিভিন্ন স্তরের গুণাবলী হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কুরআন শরীফের আয়াতে উল্লেখিত ভ্রুনের ২য় স্তর হল- “مُضْغَةً” (মুদগাহ)। مُضْغَةً হল চর্বিত দ্রব্য। যদি কেউ ১ টুকরা লোবান নিয়ে দাতে চর্বন করার পর তাকে ভ্রুনের সাথে তুলনা করতে যায় তাহলে, দেখতে পাবে দাতে চর্বন করার পর উক্ত দ্রব্য যেমন দেখায় সেটার সাথে ভ্রুনের হুবহু মিল রয়েছে। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮)

১৬৭৭ খ্রিষ্টাব্দে হাম ও লিউয়েনহোক নামক দুই বিজ্ঞানী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মানুষের বীর্যের মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব (Spermatozoma) খুজে পান রাসুল এর যুগের এক সহস্রাধিক বছর পর। এ দুইজন বিজ্ঞানীই আগে ভুলক্রমে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষের বীর্যের মধ্যে উক্ত কোষের রয়েছে অতি সামান্য প্রক্রিয়া। নারীর ডিম্বানুতে আসার পর তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। (মানবদেহের প্রবৃদ্ধি-মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯)

আর প্রফেসর কেইথ এল. মুর বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ ভ্রুন বিজ্ঞানী এবং “মানবদেহের প্রবৃদ্ধি” গ্রন্থের লেখক;যা বিশ্বের আটটি ভাষায় ছাপা হয়েছে।এটা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই।এ বইটি আমেরিকার বিশিষ্ট্য একটি গবেষণা বোর্ড কর্তৃক কোন একক লেখকের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কেইথ এল.মুর হচ্ছেন কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যা ও কোষ বিভাগের প্রফসর।তিনি ওখানে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অধীনে মৌলিক বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী ডীন হিসেবে এবং আট বছর শরীরবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি কানাডায় শরীরবিদ্যা বিভাগের উপর কৃতিত্বপূর্ণ স্বাক্ষর রাখার জন্য কানাডার শরীরবিদ্যা বোর্ডের পক্ষ থেকে J.C.B পুরস্কার পেয়েছিলেন।এছাড়া তিনি “কানাডিয়ান এন্ড এমেরিকান এসোসিয়শন এবং দি কাউন্সিল

অফ দি ইউনিয়ন অফ বাইয়োলজিকাল সাইন্স" সহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৮১ সালে সউদীর দাম্মামে অনুষ্ঠিত এক মেডিক্যাল সেমিনারে তিনি বলেন:আমার জন্য এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল যে, আমি মানব শরীরের প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে ভালোভাবে জানতে কুরআন শরীফের সহায়তা নিতাম।আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে,এ বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।কেননা,এ সকল বিষয়ের প্রায় সব কিছুই তার মৃত্যুর কয়েকশত বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে।এ ব্যাপারটি প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ আল্লাহ তায়ালার সত্য নবী। ("হাজিহী হিয়াল হাকিকাহ তথা এটাই সত্য" নামক ভিডিও ডকুমেন্টারী থেকে সংগৃহীত)

এ সময় তাকে প্রশ্ন করা হল- তাহলে কি এর অর্থ দাঁড়ায়-কুরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী? তিনি জবাব দিলেন: "আমি এ কথা মেনে নিতে কুন্ঠাবোধ করি না।"

প্রফেসর মুর একটি কনফারেন্সে বলেছিলেন: কুরআন ও হাদীসে মানবভ্রুনের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সময়কার বিভিন্ন স্তরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভিন্ন নামে ভাগ করেছে।"এর পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত চমৎকার ও বিস্তৃত অর্থ নির্দেশ করে থাকে। যা আধুনিক শরীর বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কারের সাথে সংগতিপূর্ণ।বিগত চার বছরে সপ্তম শতাব্দীতে নাযিলকৃত কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানবভ্রুন নিয়ে গবেষণা করে বিস্ময়কর ফলাফল পাওয়া গেছে।

এরিস্টোটল ভ্রুন বিদ্যার জনক হওয়া সত্বেও খৃষ্টপুর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মুরগীর ডিমের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন যে,মুরগীর বাচ্চার সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় কয়েকটি স্তরে।তবে, তিনি স্তরগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছুই জানাতে পারেন নি।ধরে নেয়া যায় যে, কুরআন নাযিলের সময় খুব কমই জানা ছিল ভ্রুনের স্তরগুলো সম্বন্ধে;যা সপ্তম শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কোন কিছুর উপর নির্ভর করে তা জানার সুযোগ ছিল না।[13]

[13] *https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%93_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8*

একটি দাবি যা ব্যাপক মনোযোগ পেয়েছে এবং এমনকি মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি মেডিকেল স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু হয়েছে তা হল যে বেশ কয়েকটি কুরআনের আয়াত ভ্রূণবিদ্যার অধ্যয়নের ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং “মানব বিকাশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির একটি বিশদ বিবরণ প্রদান করে। গ্যামেট এবং গর্ভধারণের পর্যায় থেকে পূর্ণ মেয়াদ গর্ভাবস্থা এবং প্রসব বা এমনকি প্রসব-পরবর্তী পর্যন্ত।”

১৯৮৩ সালে, ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত একটি কর্তৃপক্ষ, কিথ এল. মুর, বৈজ্ঞানিক অলৌকিক আন্দোলনের একজন নেতা আব্দুল মজিদ আল দ্বারা সহ-লেখক, ভ্রূণবিদ্যার উপর তার বহুল ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তকের একটি বিশেষ সংস্করণ (দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান: ক্লিনিকালি ওরিয়েন্টেড এমব্রায়োলজি) প্রকাশিত হয়েছিল। -জিন্দানি। এই সংস্করণ, দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান: ক্লিনিক্যালি ওরিয়েন্টেড এমব্রায়োলজি উইথ ইসলামিক অ্যাডিশনস, আল-জিন্দানির "ভ্রুণবিদ্যা-সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত এবং হাদিস" এর পৃষ্ঠাগুলিকে মুরের মূল রচনায় ছেদ করে।

অন্তত একজন মুসলিম বংশোদ্ভূত চিকিৎসক (আলি এ. রিজভি) মুর এবং আল-জিন্দানির পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নরত নিজেকে "কেন মুর এত 'বিস্মিত'" কুরআনের রেফারেন্স দ্বারা "বিভ্রান্ত" হয়েছিলেন, যা রিজভীকে "অস্পষ্ট" বলে মনে হয়েছিল এবং যতদূর তারা সুনির্দিষ্ট ছিল, এরিস্টটল এবং আয়র-বেদের পর্যবেক্ষণের পূর্বে,এবং/অথবা সহজে "সাধারণ জ্ঞান" দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আয়াত (৩৯:৬) আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন “আপনার মায়ের গর্ভে, সৃষ্টির পর সৃষ্টি, তিনটি অন্ধকারের মধ্যে, বা তিনটি অন্ধকারের পর্দা। ‘তিন’ অভিযুক্তভাবে পেটের প্রাচীর, জরায়ুর প্রাচীর এবং কোরিওঅ্যামনিওটিক ঝিল্লিকে নির্দেশ করে।” আয়াত ৩২:৯ ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশের ক্রম চিহ্নিত করে-কান, তারপর চোখ, তারপর হৃদয়।

‘তিনটি অন্ধকার’ বা তিনটি দেয়াল (৩৯:৬) সহজেই গর্ভবতী স্তন্যপায়ী প্রাণীর খোলা কাটা দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যেত, যা কুরআন নাযিলের আগে মানুষের দ্বারা করা হয়েছিল, ("গ্রীক বিজ্ঞানীদের দ্বারা মানব মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে) খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে"।

আয়াত ৩২:৯ সম্পর্কে করা দাবির বিপরীতে, চোখের সামনে কান গড়ে ওঠে না, যা হৃদয়ের আগে বিকশিত হয় না। হৃৎপিণ্ডের বিকাশ শুরু হয় “প্রায় ২০ দিনে, এবং কান এবং চোখ একই সাথে চতুর্থ সপ্তাহে বিকাশ করতে শুরু করে”। যাইহোক, শ্লোকটি নিজেই উল্লেখ করে না বা দাবি করে না যে কিভাবে ভ্রূণটি প্রথমে গর্ভে তৈরি হবে। “অতঃপর তিনি তাকে সমান করলেন এবং তার মধ্যে তাঁর [সৃষ্ট] আত্মা থেকে ফুঁক দিলেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি ও হৃদয় সৃষ্টি করলেন; তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞ।”

ভ্রূণটি একটি জোঁকের অনুরূপ হতে পারে (২৩:১৩-১৪-এ আল-3আলাকার আল-3আলাকার "আল "ক্লিংিং ক্লট" বা "জোঁকের মতো গঠন"), কিন্তু এটি তার বিকাশের আট সপ্তাহের সময়কালে অনেক কিছুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ - খুব বেশি সময়ের জন্য কোনটিই নয়।

যদিও এটি সাধারণত সম্মত হয় যে কুরআনে শুক্রাণু (অনেকটি আয়াতে আন-নুতফা), শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিশ্রণের "শুক্রাণু-ড্রপ মিশ্রণ" (আন-নুফাতিন আমশাজিন) আরও সমস্যাযুক্ত কারণ কোরানের কোথাও উল্লেখ নেই। ডিম্বাণু কোষ বা ডিম্বাণু - ভ্রূণের বিকাশের যে কোনো বর্ণনায় একটি বরং স্পষ্ট বাদ, কারণ এটি ডিম্বাণু ভ্রূণের অর্ধেকেরও বেশি জেনেটিক উপাদানের উৎস।

কুরআন পুরুষের শুক্রাণুর উল্লেখ আছে কিন্তু স্ত্রী ডিম্বাণু নয়, ৫৩:৪৫-৪৬ — "এবং তিনি নির্গত হওয়ার সময় শুক্রাণু-বিন্দু থেকে দুই সঙ্গী, নর-নারী সৃষ্টি করেন"-এর কথা বলা হচ্ছে। ভ্রান্ত ধারণা যে সন্তানের জন্য সমস্ত জেনেটিক উপাদান পুরুষের কাছ থেকে আসে এবং মা কেবল বিকাশমান শিশুর জন্য একটি গর্ভ সরবরাহ করে (যেমন শুক্রাণু X

এবং Y ক্রোমোজোমের অবদান রাখে যা শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করে)। এই ধারণাটি প্রাচীন গ্রীকদের সাথে উদ্ভূত হয়েছিল এবং আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিকাশের আগে এটি জনপ্রিয় ছিল।

২০০২ সালে, মুর ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল দ্বারা ইসলামের বিষয়ে তার কাজের বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিতে অস্বীকার করেন, এই বলে যে "আমি কোরানের সাথে জড়িত ছিলাম দশ বা এগারো বছর হয়ে গেছে।"[14]

[14]*https://dawatulislam24.com/?menu=NewsDetail&menuName=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8&Detail=5109*

৩.২। পরাগায়ন

“আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানাও পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষের গৃহে।”(সূরা নাহল, আয়াতঃ ৬৮)।

“অতঃপর শোষণ করে নাও প্রত্যেক ফুল হতে এবং চলো তোমার প্রতিপালকের সরল পথে।”(সূরা নাহল, আয়াতঃ ৬৯)

১৯৭৩ সালে বিজ্ঞানী কার্ল ভন Frisch Physiology of Medicine বিষয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পান।তার গবেষণার বিষয় “মৌমাছির জীবনচক্র”। তিনি প্রমাণ করেছেন মৌমাছি তিন ধরনের পুরুষ মৌমাচি, স্ত্রী মৌমাছি ও ডিম না পাড়া স্ত্রী মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, মৌচাক বানায় ও ডিম পাড়ে। পুরুষ মৌমাছির বেশি কাজ নেই।বাকি কাজ অন্যান্য স্ত্রী মৌমাছি করে।ডিম পাড়া মৌমাছি হলো কুইন বি, অন্য স্ত্রীরা হলো ওয়ার্কার বি। কোনো মৌমাছি মধুর সন্ধান পেলে তার সঙ্গীদের এসে খবর দেয় ও রাস্তা চিনিয়ে দেয়।তারা এক সরল রেখায় চলে। রাস্তার বর্ণনা দিতে কোনো হেরফের হয় না। এর নাম দিয়েছেন তিনি ওয়াগল ড্যান্স।

আরবিতে ক্রিয়াবাচক শব্দ স্ত্রী ও পুরুষের জন্য সর্বদা আলাদা ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইংরেজিতে সর্বনাম পদ ভিন্ন হয়।

৬৮ নাম্বার আয়াতে কাজগুলো বুঝাতে ‘ইত্তাখিযি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; যা কেবল নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।পুরুষ হলে শব্দটা হতো ‘ইত্তাখিয’। কুরআন ৬৮ নাম্বার আয়াতে কাজগুলো নারী মৌমাছিদের করতে বলছে।

৬৯ নাম্বার আয়াতে মধু শোষণ করতে ‘কুলি’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; যা নারীবাচক।পুরুষের ক্ষেত্রে তা ‘কুল’। সরল পথে চলার কথায় নারীবাচক ক্রিয়া ‘উসলুকি’ ব্যবহৃত হয়েছে, পুরুষবাচক ‘উসলুক’ নয়।

এ আয়াতে সরল পথের কথা বলা হয়েছে, এটা বস্তুগত সরল পথ। রূপক অর্থে ভালো কাজের পথ বুঝানো হয়নি, কারণ মৌমাছির জন্য পাপ-পূণ্য বলতে কিছু নেই। সুতরাং, এখানে এক সরলপথে চলার কথাই বলা আছে।

যে বিষয়টি ১৯৭৩ সালে একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন।

"তিনিই সে সত্তা (আল্লাহ) যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে যা কিছু রয়েছে জমিনে, অতঃপর তিনি মনসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত।" (বাকারা, ০২ : ২৯)

"আর আমি তোমাদের ওপর সৃষ্টি করেছি সপ্তপথ।" (সূরা মুমিনূন, আয়াতঃ১৭)।
"আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপর মজবুত সপ্ত আকাশ।" (সূরা নাবা, আয়াতঃ ১২)।"

এই আয়াতগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রহস্য হয়েই থেকে গেছে। এমনকি এই বিজ্ঞানের যুগের মানুষদের কাছেও।[15]

---

[15] https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE

৩.৩। হৃদপিণ্ডের কার্যাবলি

সমালোচকগণ বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানে এটি সতত প্রমাণিত একটি বিষয় যে, মানুষের বোধশক্তি, চিন্তাভাবনা করে তার মস্তিষ্ক। এতদসত্ত্বেও কুরআন বারবার হৃদয়কে তথা হৃদপিণ্ডকে নির্দেশ করেছে চিন্তাভাবনা ও বোধশক্তির ব্যাপারে।

“আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একত্ব আবৃত্তি করেন, তখন ও অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ট প্রদর্শন করে চলে যায়।” (কুরআন, ১৭:৪৬)

অভিযোগের প্রত্যুত্তরে, মুসলিম মনীষীগণ আরবি অভিধানের সহায়ত নিয়েছেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে, মূলত কুরআন চিন্তাশক্তির জন্য যে শব্দটির কথা বলেছে সেটি হলোঃ 'ক্বালব'। একই ধরনের কার্যাবলি ব্যাখ্যার জন্য কুরআন অন্যত্র বিভিন্ন আয়াতে 'সদর' শব্দটি ব্যবহার করেছে। কুরআনের আয়াতসমূহের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হিসেবে মুসলিমগণের মাঝে স্বীকৃত পদ্ধতি হলো কুরআনকে কুরআন দ্বারা ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ, কুরআনের একটী আয়াতকে অন্য আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। ফলে, মুসলিম তাফসীরকারকগণের কাছে এটি সুস্পষ্ট যে, 'কালব' এর অর্থ 'সদর'। আর আরবিতে 'সদর' শব্দের অর্থ বক্ষ, বুক, হৃদয়, অন্তর, কেন্দ্র, প্রধান ইত্যাদি।

কাজেই চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধির জন্য কুরআন যে 'কালব' বা 'সদর' শব্দ ব্যবহার করেছে তার অর্থঃ কেন্দ্র তথা মস্তিষ্ক।[16]

---

[16] *https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE*

ভূতত্ত্ববিদ্যা ও আবহাওয়াবিদ্যা

৪.১। পৃথিবী সমতল

কুরআন প্রচলনের যুগে মানুষের মাঝে এ ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবী সমতল। গ্রিক দার্শনিক টলেমি থেকে শুরু করে তৎকালীন যুগের বড় বড় মনীষীগণ সবাই এ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কুরআনও অনুরূপ ধারণাই ব্যক্ত করেছে পৃথিবীর আকৃতির ব্যাপারে।

“আর (অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আল্লাহ্) কীভাবে পৃথিবীকে সমতল করেছেন?” (কুরআন, ৮৮ঃ২০)

পর্বতমালা ভূমিকম্প প্রতিরোধ করে

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, পৃথিবী পৃষ্ঠে ভূমিকম্পের কারণে বিভিন্ন পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে। এসকল পর্বতমালা মোটেও ভূমিকম্প প্রতিরোধ করার কোন কাজে আসে না। উপরন্তু দেখা যায়, যেসব অঞ্চলে পাহাড়-পর্বত বেশি আছে, ঐসব অঞ্চলে ভূমিকম্প বেশি হয়।

এবং তিনি পৃথিবীর উপর এমনভাবে পর্বতকে গেঁথে দিয়েছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (সুরা নাহল ১৬:১৫)

মুসলিম ভাষ্যকারগণ এরূপ অভিযোগের কড়া সমালোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, কুরআন এখানে কোথাও বলে নি যে, পাহাড়-পর্বতের কাজ ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা। বরং পাহাড়-পর্বত এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে করে পৃথিবী মানুষদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়, বা হেলে না পড়ে। পাহাড়-পর্বতের কারণে পৃথিবীর স্থিতিশীলতা বেড়েছে। ফলে, পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন নির্দিষ্ট মূহুর্তে ওজন বেশি জড় হওয়ায় পৃথিবী ঐদিকে ঘুরে যাওয়া, হেলে যাওয়া বা নড়ে পড়া এসব কিছুই হয় না। অতএব, কুরআনের এই বক্তব্য বিজ্ঞানের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়, বরং বিজ্ঞানের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পর্বতমালা পেরেকের মতো, একে উপর থেকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে

সমালোচকগণ বলেন যে, কুরআন পর্বতকে পেরেক হিসেবে উপমা পেশ করেছে। ফলে এটা উল্লেখ থাকা কুরআনে অস্বাভাবিক নয় যে, এই পেরেকরূপী পর্বতকে পেরেকের মতই হাতুড়ি সদৃশ বস্তু দিয়ে আঘাত করে করে পৃথিবীর মাটির সাথে গেঁথে দিয়েছে।

অথচ আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্লেটের মধ্যকার সংঘর্ষের কারণে পর্বতমালা গড়ে উঠেছে। উপর থেকে গেঁথে দেবার তত্ত্বে বিজ্ঞান বিশ্বাসী নয়।

“আমি পৃথিবীকে করেছি কীলক।” (কুরআন ৭৮ঃ৬)

“এবং তিনি পৃথিবীর উপর এমনভাবে পর্বতকে গেঁথে দিয়েছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও।” (সুরা নাহল ১৬:১৫)

মুসলিম ভাষ্যকারগণ বলেছেন যে, কুরআন যখন পৃথিবীর উপরস্থিত পর্বতের সাথে পেরেকের উদাহরণ দেয়, তখন এর অর্থ পর্বতকে পেরেকের মতো পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছে তা বুঝানো নয়। বরং পৃথিবীর পাহাড়-পর্বতের কাজের ধরন কেমন সেটি বুঝানো। কুরআন বলছে যে, পেরেক যেমন অন্য বস্তুর মধ্যে এমন ভাবে ঢুকানো হয় যে, এর সামান্য একটি অংশই কেবল বাহির থেকে দেখা যায়, আর বড় অংশ দেখা যায় না- পর্বতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, মাটির উপরে পর্বতের যতটুকু দৃশ্যমান হয়, তা পুরো পর্বতের কিয়দংশ মাত্র। পর্বতের দীর্ঘ একটি অংশ মাটির সুগভীরে প্রোথিত থাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করে, যেমনটী করে থাকে কীলক বা পেরেক। কাজেই কুরআনে পর্বতমালাকে পেরেকের সাথে তুলনা করা অতি যথার্থ বলে মন্তব্য করেন ইসলামি ভাষ্যকারগণ।

৪.২। বৃষ্টির পানির বিশুদ্ধতা

সমালোচকগণ বলেন যে, কুরআনে বৃষ্টির পানিকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্যানুযায়ী, বৃষ্টির পানি সব সময় দূষণমুক্ত থাকে না। বিশেষত, শিল্পাঞ্চলীয় এলাকায় বৃষ্টির পানি অত্যন্ত দূষিত থাকে। এসব জায়গায় বৃষ্টি পতিত হলে পানি বাতাসে উপস্থিত বিভিন্ন গ্যাসের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে অম্ল বা এসিড উৎপন্ন করে, যা এসিড বৃষ্টি নামে পরিচিত।

"আর আমি মেঘমালা থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।" **(কুরআন, ২৫ঃ৪৮)**

ইসলামি ব্যাখ্যাকারগণ উপর্যুক্ত আয়াতের জবাবে বলেন যে, কুরআনে বৃষ্টির পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভূ-পৃষ্ঠস্থ দূষিত ও ময়লাযুক্ত পানি বাষ্পীভূত হয়। এ সময় সূর্যালোকের তাপে কেবল পানিই বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে যায়, ময়লা-ধুলি-মাটি ইত্যাদি জলাশয়ে পড়ে থাকে। বাষ্পীভূত হবার পর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন ধুলি-বালির সাথে জলীয় বাষ্পে মিশে যায় বটে, তবে ঊর্ধ্বস্থানে উঠে আবার ঘনীভূত হবার সময় কেবল জলীয় বাষ্পই ঘনীভূত হয়ে মেঘ তৈরি করে। ফলে, মেঘ থেকে যখন বৃষ্টি হয়, তখন এই অতি সামান্য ধুলোবালি বাদ দিলে দেখা যায়, বৃষ্টির পানি অতি বিশুদ্ধ।

আধুনিক যুগে মানুষের অসচেতনতা, প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টকরণের দরুন বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস ইত্যাদির পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে, পতনশীল বৃষ্টির পানি এসবের সাথে বিক্রিয়া করে বিভিন্ন ধরনের অম্ল বা এসিড উৎপন্ন করে। এ থেকে বোঝা যায়, বৃষ্টির পানি সহজাতভাবে বিশুদ্ধ। যদি মানুষের হস্তক্ষেপের দরুন বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস অস্বাভাবিক মাত্রায় বায়ুমণ্ডলে নির্গত না হতো তবে বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ রূপেই ভূ-পৃষ্ঠে এসে পতিত হতো।

ফলে, মুসলিম ব্যাখ্যাকারদের মতে, কুরআন বৃষ্টির পানিকে বিশুদ্ধ বলে যথেষ্ট বিজ্ঞানমনস্কতার প্রমাণ দিয়েছে।

৪.৩। অসম্পূর্ণ পানিচক্র

কুরআনের সমালোচকগণ বলেন যে, কুরআন বিভিন্ন স্থানে পানির প্রবাহ, সাগর-নদী-জলাশয়ে পানি জমা হওয়া, মেঘ সৃষ্টি হওয়া, বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করেছে। এসব আয়াত থেকে কুরআন পানিচক্র সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করে, সে সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। এসকল বিচ্ছিন্ন আয়াতগুলোকে জড়ো করে কিছু মুসলিম ব্যাখ্যাকার দাবি করেন যে, বিজ্ঞান আবিষ্কারের অনেক আগেই কুরআন পানিচক্রের পূর্ণাংগ ধাপে ব্যাখ্যা করেছে।

তাদের এ দাবিকে অসার মন্তব্য করে সমালোচকগণ বলেন যে, পানি চক্রের ধাপগুলো হচ্ছে, (১) মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসা (২) ভূ-পৃষ্ঠ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে কিছু পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করা এবং কিছু পরিমাণ ভূপৃষ্ঠ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খাল-বিল-পুকুর-নদী-সাগর ইত্যাদি জলাশয়ে মিলিত হওয়া, (৩) বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠস্থ জলাশয়ের পানি জলীয় বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাওয়া (৪) জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ তৈরি হওয়া।

সমালোচকগণ বলেন, পানি চক্রের এ প্রধান চারটি ধাপের মধ্যে ১, ২, ও ৪ নম্বর ধাপ তিনটি আমাদের অতি পরিচিত এবং খালি চোখেই দেখা যায়। বাষ্পীভবনের ধাপটি চোখে দেখা যায় না এবং চিন্তা করাও অত্যন্ত দুষ্কর। আশ্চর্যজনকভাবে, কুরআন বিভিন্ন স্থানে পানি চক্রের ১, ২, ও ৪ নম্বর ধাপগুলো পুংখানুপুংখরূপে বর্ণনা করেছে, যা সহজেই চোখে দেখা যায় এবং সপ্তম শতকের একজন মানুষের জন্য খুবই সাধারণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু যেটি সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়, সেটি হলো বাষ্পীভবন। এটি খালি চোখে দেখা যায় না এবং এ সম্বন্ধে পূর্ব থেকে জ্ঞান না থাকলে এটি কল্পনা করাও দুরূহ। কুরআন খুবই বিস্ময়করভাবে বাষ্পীভবনের এ ধাপটি নিয়ে মৌনতাবলম্বন করেছে, যা এটিই নির্দেশ করে যে, কুরআনের রচয়িতা সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ বহির্ভূত এ ঘটনাটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলো না।

মুসলিম ব্যাখ্যাকারগণ উপর্যুক্ত সমালোচনার জবাবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন।

“শপথ আকাশের, যা প্রত্যাবর্তককে (পানিচক্র) ধারণ করে।” (সূরা ত্বারিক)

উপরের এ আয়াতটি প্রকৃতই বাষ্পীভবনের ধাপটি সম্বন্ধে পাঠককে প্রকৃত তথ্য প্রদান করে। ফলে, মুসলিম মনীষীগণ বলেন, কুরআনে পানিচক্রের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৪.৪। আকাশস্থিত পর্বত হতে শিলা আসে

আবহাওয়াবিদ্যা অনুসারে, মেঘখণ্ডের মধ্যে শিলার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে, শিলা সৃষ্টি হয় পাহাড় হতে। আর সেই পাহাড় কিনা আবার আকাশে অবস্থিত।

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।" (কুরআন,২৪:৪৩)

তাফসীরে জালালাইন উপরের আয়াতের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছে, এর দ্বারা আকাশের পর্বত বোঝানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আলোচ্য আয়াতে 'আকাশের পর্বত' দ্বারা আকাশস্থিত 'মেঘ' বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীর এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হতে পারে, 'পর্বত' শব্দটি দ্বারা আকাশে অবস্থিত শিলার পাহাড়কে বোঝানো হয়েছে; আবার এও হতে পারে যে, এর দ্বারা রূপকার্থে 'মেঘ' বোঝানো হয়েছে। তাফসীরকারকদের ব্যাখ্যানুযায়ী, আলোচ্য আয়াতে বিজ্ঞানবিরোধী কিছু নেই।

প্রাণিবিদ্যা

কুরআন প্রাণি বিষয়ে কিছু আয়াত উপস্থাপন করেছে, প্রাণিবিদ্যার দৃষ্টিতে যা গুরুত্বের সাথে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে।

পিঁপড়ার মানুষের মত বৃহৎকায় প্রাণি সনাক্তকরণ ও নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা

কুরআন নবী সুলাইমানের কিছু ঘটনা প্রসংগে পিঁপড়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, পিঁপড়া সুলাইমান ও তার ধেয়ে আসা দলকে দেখতে পেল। এমনকি, পিঁপড়াদের মধ্যে একটি পিঁপড়া সুলাইমানকে চিনতেও পারল। মানুষ যেভাবে মানুষের সাথে উন্নত পদ্ধতি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, পিঁপড়ারাও একই রকমভাবে উন্নত যোগাযোগ করে। বিজ্ঞান যদিও নিশ্চিত হয়েছে যে, পিঁপড়েরা এক ধরনের তাড়িত-রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বটে, কিন্তু তাদের এ যোগাযোগ মানুষের কথা-বার্তা বা ভাষার মত এত উন্নত নয়। সমালোচকগণ এ ঘটনাকে "রূপকথার গল্প" (Fairy Tale) হিসেবে মন্তব্য করেছেন।

“যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।” (সুরা নামল ২৭:১৮)

কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণ উপরের সমালোচনার জবাবে বলেন, আধুনিক বিজ্ঞান মোতাবেক প্রাণিকুল পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম, এমনকি উদ্ভিদগুলোও পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই তথ্য জানবার আগে কুরআনে বর্ণিত সুলাইমান ও পিঁপড়ার গল্পটি অলীক মনে হতে পারে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য কুরআনের দেওয়া তথ্যেরই সমর্থন করছে।

ইসলামিক বিধিবিধান ও এর বৈজ্ঞানিক কার্যকারীতা

৬.১। মন নিমন্ত্রণে সালাতের গুরুত্ব

প্রশ্ন হলো, আমাদের মন ঘুরে বেড়ায় কেনো! এর কারণ হলো আমাদের মন আসলে খালি। কিন্তু মন কখনো খালি থাকতে পারে না। সেজন্য মন ঘুরে বেড়ায়। বেশির ভাগ মুসলিম সালাত আদায়ের সময় যা পাঠ করেন তা পূর্বে থেকেই জানেন। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং পবিত্র কুরআনের ছোট সূরা আমরা আয়াতের মধ্যে পাঠ করে থাকি। আমরা এই সূরাগুলো এতো যান্ত্রিকভাবে পড়ি তা সত্যিই বিস্ময়কর। আপনি যদি কোনো মুসলিমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে বলেন তবে সে ১০০ মাইল Speed-এও পড়তে সক্ষম। অর্থাৎ এরূপ যান্ত্রিকভাবে পাঠের কারণে আমাদের মনের খুব সামান্য একটা অংশ এ কাজে ব্যস্ত থাকে । এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বলার কারণে আমরা পূর্ণ মনোযোগী হতে পারি না।

আমরা বেশিরভাগ মুসলিমই অনারব। আরবি ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তাই সালাতের সময় আরবি ভাষার সূরা পাঠ করলেও তা আমরা খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না। আর এ না বোঝার কারণেই আমাদের মন তখন 'চিন্তা কার্যে' পুরোপুরি নিয়োজিত হতে ব্যর্থ হয়। সেজন্য নামাযে আমরা যে আয়াতগুলো পড়ব সেগুলোর অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করব। যদি আপনি ইংরেজি জানেন তবে ইংরেজি অনুবাদ জানার চেষ্টা করেন। যদি উর্দূ জানেন তবে উর্দূ অনুবাদটা মনে করুন। একইভাবে হিন্দি ভাষীরা হিন্দি অনুবাদটা স্মরণে আনুন। যদি মারাঠি জানেন তবে সেটাই মনে করুন। যদি গুজরাটি জানেন গুজরাটি মনে করুন। অর্থাৎ যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন সে ভাষায় সূরাটির অর্থ আপনি মনে করুন। যেমন ধরুন আপনি যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ.

অর্থঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা । যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

যখন আপনি এই সূরা ফাতিহা পড়বেন অথবা আরবিতে অন্য কোনো আয়াত পড়বেন একই সাথে অর্থটাও মনে করুন। তাহলে আপনার মন-মগজ আয়াতের অর্থ মনে করার কাজেই ব্যস্ত থাকছে। কিন্তু কয়েকদিন পরে কিংবা কয়েকমাস পরে এ পদ্ধতিটাও যান্ত্রিক হয়ে যাবে। আমাদের মন খুব শক্তিশালী হওয়ায় এখানেও মনোযোগ ছেদনের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু সম্ভাবনাটা খুব কম, কারণ মনের খুব ছোট্ট অংশ আরবী পড়ায় ব্যস্ত থাকবে আর বাকী অংশটা অর্থ মনে করবে। অন্য চিন্তা করার সম্ভাবনা কম থাকবে। তারপরও মন অন্য চিন্তা করতে পারে। মনের এই চিন্তা দূর করার জন্য আপনি আরবিতে আয়াতগুলো পড়বেন আর সেগুলোর অর্থ মনে করবেন। এছাড়াও আপনি মনোযোগ দেবেন যে আয়াত আপনি পড়ছেন এবং যার অর্থ মনে করছেন তার প্রতি ।

একজন মানুষ দুটি জিনিসের ওপর শতভাগ মনোযোগ দিতে পারে না। এক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ কিংবা ৮০ বা ২০ ভাগ মনোযোগ দেয়া যায়। কিন্তু দুটি জিনিসের ওপর শতভাগ মনোযোগ দেয়া যায় না। তাহলে যত বেশী মনোযোগ দেবেন আপনার মন তত কম বাইরে ঘুরাঘুরি করবে। মনের এই ঘুরাঘুরি বন্ধ করতে আমরা আরবি আয়াতগুলো পড়ব। আয়াতের অর্থ বুঝব। আর সেই অর্থের ওপর মনোযোগ দেব। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের মন ঘুরাঘুরি করবে না ।

এ সম্পর্কে সূরা আনকাবুতের ৪৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الكِتب وأَقِمِ الصَّلوةَ إِنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عن وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

অর্থঃ পাঠ কর সেই কিতাব হতে, যেটি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ । আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর ।

তাহলে পবিত্র কুরআন বলছে 'সালাত' আপনাকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই আমি 'সালাত'কে এক ধরনের Programming বলেছি। এই Programming টা হলো ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য। তাহলে আমরা মুসলিমরা দিনে ৫ বার সালাতের মাধ্যমে Programmed হই। আমরা এ সময় আল্লাহর কাছে নির্দেশনা চাই- ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম; আমাদের সরল পথ দেখাও। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এর উত্তর দেন। তিনি আমাদের ন্যায়পরায়ণতার পথে Programmed করেন। যেমন ধরুন কোনো ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পরে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াত পড়তে পারেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে-

يااَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

এখানে সালাতে আমাদেরকে Programming করা হচ্ছে যে, আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে মদ পান থেকে। জুয়া খেলা, বিভিন্ন মূর্তির পূজা, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ এগুলো সব শয়তানের কাজ। ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পর পড়তে পারেন সূরা মায়েদার ৩ নম্বর আয়াত। সেখানে বলা হয়েছে-

حرم عليكم امة والدمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه والمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكل السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فشق اليوم يئس الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوهُمْ وَاخْشون - الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا فَمَنِ اضْطَرَ فِي مَخْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَاثِمِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করেছ; যে জন্তু 'যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো। আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোনো গোনাহ্র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।[17]

[17] *রচনাসমগ্র: ডা. জাকির নায়েক ॥ পেজ ২৩১-২৩৪*

৬.২। নামাযের মাধ্যমে শারীরিক উপকারিতাসমূহ

সামাজিক উপকারিতা ও আত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি নামায থেকে আমরা বিভিন্ন শারীরিক উপকারিতা লাভ করি। নামাযের সময় যখন রুকুতে যাই শরীরের উপরি অংশে তখন অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। মেরুদণ্ড হয়ে যায় নমনীয়। এর বিভিন্ন নার্ভ শক্তিশালী হয়। পীঠের ব্যথা দূর হয়। দূর হয় পেট ফাপা জাতীয় সমস্যাগুলো। এরপর যখন উঠে দাঁড়াই তখন শরীরের উপরের অংশটুকুতে যেটুকু রক্ত পরিবাহিত হয়েছে সেই প্রবাহ তখন স্বাভাবিক হয়। শরীর তখন সতেজ হয়।

যখন আমরা সিজদা দেই তখন আমাদের কপাল মাটিতে লাগে- এটা হলো সালাতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেকদিন মানুষের শরীর তার চারপাশের বিভিন্ন ইলেকট্র স্ট্যাটিক চার্জের সংস্পর্শে আসে। এই চার্জ তারপর মানুষের নার্ভ সিস্টেমে গিয়ে পৌঁছায়। আর সেখানেই জমা হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ইলেকট্র স্ট্যাটিক চার্জ শরীর থেকে বের করে দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে আপনি মাথা ব্যথায় ভুগবেন, পিঠে ব্যাথা হবে। মাংস পেশীতে টান পড়বে। প্রেসার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আমরা ট্রাঙ্কক্যুইলাজার ব্যবহার আর বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ সেবন করি। অতিরিক্ত ইলেকট্রচার্য আমাদের শরীর থেকে বের করে দিতে হয়।

যেমন ধরুন, এমন কোনো যন্ত্র যেখানে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। সেখানে সাধারণত তিন পিনের প্লাগ ব্যবহার করতে দেখা যায়। তৃতীয় পিন বা তৃতীয় তারটা মাটিতে সংযোগ দিয়ে আর্থিং করা হয়। একইভাবে আমরা যখন সিজদায় যাই, আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই, তখন শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্রেন আর ব্রেনের শ্রেষ্ঠঅংশ Frontal log' মাটিতে ঠেকানো হয়। এসময় অতিরিক্ত ইলেকট্র স্টাটিক চার্জ মাটিতে চে যায়। তার মানে এই নয় যে, সে সময় আপনার কপালের নিচে হাত রাখলে আপনি শক খাবেন সিজদার সময় আমরা Frontal log মাটিতে ঠেকাই। ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সে অংশটি মাথার উপরে থাকে না, সেটা থাকে Frontal log এ। সে জন্যই আমরা সালাতের মধ্যে সিজদা করি। যখন আমরা সিজদায় যাই, তখন আমাদের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। যখন সিজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়া ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে

আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্য খুবই উপকারী।

সিজদার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অসুখ থেকে বাঁচতে পারি। যেমন- ফাইব্রোসাইটিস ও চিলড্রেন। যখন সিজদা করি তখন প্যারাবাইকাল সাইনোসাইটিসের ড্রেনেজ তৈরী হয়। এতে সাইনোসাইটিস-এর ঝুঁকি কমে যায়। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ। আর ম্যাগজিলারি সাইনাস-এর ড্রেনেজ থাকে শরীরের ওপরের অংশে। আমরা সারাদিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বলে এর চলাচল থেমে থাকে। সেজন্য যখন আমরা সিজদায় যাই (ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে একটা পাত্র উল্টে দিলাম) তখন ম্যাগজিলারিজ সাইনাসের ড্রেনেজটা সচল হয়। এছাড়াও এতে করে আমাদের শরীরের ফ্রন্টাল সাইনাসের; এখানাডিয়াস সাইনাস এবং স্পেনোডিয়াস সাইনাসের ড্রেনেজ তৈরী হয়। তাই সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অথবা সাইনোসাইটিস যদি থেকেও থাকে তবে এটা তার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অর্থাৎ সিজদা সাইনোসাইটিসে আক্রান্ত জন্য প্রাকৃতিক যেসব মানুষ ব্রংকাইটিস রোগে ভুগে থাকেন তাদের ব্রংকিলটি দিয়ে রক্ত নিঃসৃত হতে পারে। সিজদার কারণে ব্রংকিলট্রিতে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না। এতে বিভিন্ন পালমনারি রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে যেখানে আমাদের শরীরের রস জমা হয়। আমাদের শরীরে রস ছাড়াও ধুলাবালি আর রোগ জীবাণু জমা হতে পারে। সিজদার মাধ্যমে এসব অসুখের উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই তখন আমাদের ফুসফুসের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশে ফুসফুসের বাতাস থেকে যায় । মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ তাজা বাতাস ফুসফুসে ঢোকে আর বের হয়ে যায়। বাকি এক-তৃতীয়াংশে চলে রেসিডিয়াল এয়ার। আমরা যখন সিজদা করি তখন আমাদের তল পেট চাপ দেয় আমাদের ডায়াফ্রামে। আর এ ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে। আর এতে ফুসফুসের সেই রেসিডিয়াল এয়ার বের হয়ে যায় । তাহলে এই দুষিত বায়ু বের হয়ে গেলে আরো তাজা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। এভাবে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয়। যখন সিজদা করি তখন যেহেতু অভিকর্ষবল কমে যায়, ফলে তলপেটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। তলপেটের ভেতরের বিভিন্ন ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়।

সিজদা এবং রুকুর মাধ্যমে হারনিয়া, ফিমোরাল ইত্যাদি অসুখের নিরাময় হয়ে থাকে। এছাড়াও সিজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয়। এর মধ্যে একটি অসুখ হলো হেনোরয়েড যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে পাইলস। আবার সিজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থান চ্যুতিকে রোধ করা যায়। যখন সিজদাহ করি তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে হাটুর ওপরে। আমাদের পা থাকে নমনীয়। এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যাসটোলডিম মাসল থাকে, যাকে পেরিফেরাল হার্ট বলা হয় কারণ এ মাসলগুলোতে অনেকগুলো ধমনী আছে। আর এ ধমনীগুলো দিয়ে শরীরের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে শরীরের নিচের অংশ রিলাক্স হয়। যখন সিজদায় যাই আমাদের হাটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে। এই পদ্ধতিতে কার্ভাইকাল স্পাইনের বিভিন্ন অসুখের নিরাময় হয়। কারণ এই সিজদার মাধ্যমে ইন্টার ডায়োটিব্রাল জয়েন্টের উপকার হয়। সিজদার মাধ্যমে বিভিন্ন হৃদরোগের উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠি, হাটু গেড়ে বসি, শরীরের ওপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীরও রিলাক্স হয়। তখন আমাদের উরু আর পিঠের ধ্বমনীর মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। এতে পিঠের মাংস পেশী রিলাক্স হয়। সিজদার মাধ্যমে আমরা কোষ্টকাঠিন্য আর বদহজম রোগের উপকার পেয়ে থাকি। অর্থাৎ যারা প্যাপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর অন্য কোনো রোগে ভুগছেন তারাও বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর এ নিয়মের কারণে উপকৃত হবেন। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াই তখন আমাদের শরীরের ভর থাকে পায়ের ওপরে। এভাবে আমাদের পিঠের মাসল, হাটুর মাসল, উরুর মাসল আর পায়ের মাসল শক্ত হয়। যখন আমরা সালাত আদায় করি তখন আমরা শারীরিকভাবে উপকৃত হই। তবে মুসলিমরা কেবল শারীরিক উপকারিতার জন্য সালাত আদায় করে না। এটা হলো বাড়তি উপকার। আমরা সালাত আদায় করি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা অর্জনের জন্য। তাকে ধন্যবাদ জানাতে। আমরা সালাত আদায় করি নির্দেশনার জন্য ন্যায় নিষ্ঠার পথে Programmed হওয়ার জন্য।

সালাতের এমন উপকার তাদেরকে আকৃষ্ট করবে যাদের বিশ্বাস কম বা যারা অমুসলিম। কিন্তু মুসলিমদের প্রধান কাজ হলো আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা। কারণ এটাই আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলার নির্দেশ। এটাই আমাদের বিশেষত্ব। কিছু মুসলিম আছে যারা

বলবে, কিছু কিছু নামাযি আছেন যারা নামায পড়ে আবার লোক ঠকায়। তারা সৎ নয়। ন্যায়পরায়ণ নয়। তাহলে আপনি কিভাবে বললেন সালাত ন্যায়পরায়নতার Programming? আমরা জানি কিছু মুসলিম প্রত্যেকদিন ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে। তারপরও তারা ন্যায়নিষ্ঠ নন। এই প্রশ্নের উত্তরটার জন্য সূরা মু'মিনূনের ১ ও ২ নং আয়াতই যথেষ্ট। যেখানে বলা হয়েছে-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ

অর্থ : অবশ্যই মু'মিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র।

আরবি শব্দ খাশিউন- এটা এসেছে 'খুশু' থেকে, যার অর্থ নম্রতা ও মনোযোগ দেয়া। সেজন্য আল্লাহ বলেছেন, যারা সালাত আদায় করে মনোযোগের সাথে ও নম্রভাবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে। তারাই সালাতের উপকারগুলো পাবে। কিন্তু যারা বাইরে থেকে সালাত আদায় করে কোনো নম্রতা ও মনোযোগ ছাড়া, তারা সালাতের উপকারগুলো কখনোই পাবে না। তাহলে এই মুসলিমরা যারা সালাত আদায় করে কিন্তু এ থেকে কোনো উপকার পায় না, তারা ন্যায়পরায়ণ নয়। এর কারণ তারা সালাত আদায় করে বাইরে থেকে। কোনো রকম নম্রতা এবং মনোযোগ ছাড়া। আর যদি কেউ মনোযোগী হতে চায় তাহলে সে নামাযে যা পাঠ করছে তার অর্থ জানতে হবে। যেমন ধরুন নামাযের সময় ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পরে পড়লেন সূরা ইখলাস। আর বললেন- বল, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। সব মুসলিমই যারা মসজিদে এসে সালাত আদায় করে তারা সবাই মানবে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। কেউ এ কথা বলবে না, আল্লাহ এক নয়। আল্লাহ এখানে ইমাম সাহেবকে নির্দেশনা দিচ্ছেন; ইমাম এখানে যা করছেন তিনি মুসলিমদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। আর বলছেন বল, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এই কথাটা তাদের কাছে বল যারা একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ।

অনেক মুসলিমই নামায পড়েন এবং যখনই তারা নামায শেষ করেন, তারা নামাযের সময় যেসব কথা বলেছিলেন সেসব কথার প্রভাবের ওপর থাকেন না। আর এটার প্রধান কারণ হলো তারা এ কথাগুলো বুঝতে পারেননি। আপনি যদি সেগুলো বুঝতেই না পারেন তবে প্রয়োগ করবেন কীভাবে?[18]

---

[18]*রচনাসমগ্র: ডা. জাকির নায়েক; পেজ ২৪৮-২৫১*

৬.৩। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অজুর গুরুত্ব

পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রজাতি হল ব্যাকটেরিয়া। পৃথিবীতে চার কোয়াড্রিলিয়ন কোয়াড্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এটি মানুষের সংখ্যার ৫০০ বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ," Netflix-এর টিভি শো "Brainchild" জীবাণুর উপর তার পর্বে বলেছে- গড় হ্যান্ডশেক তিন সেকেন্ড স্থায়ী হয়; যার সময় ১২৪ মিলিয়ন জীবাণু আক্ষরিকভাবে হাত বিনিময় করে।

কিছু জীবাণু ভালো কিন্তু আমাদের হাত থেকে কিছু খারাপ জীবাণু আমাদের পেটে ঢুকে আমাদের অসুস্থ করে দিতে পারে। তবুও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মুসলমানরা সর্বাধিক ঘন ঘন হ্যান্ডশেকার। কারণ ইসলাম এটিকে অবশ্য কর্তব্য করেছে। ইসলাম বলে অযুর সাথে গুনাহ মাফ হয়। তাহলে কি মুসলমানরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে? মোটেই নয়, কারণ ইসলামিক অনুশীলনগুলিও নিশ্চিত করে যে আমরা জীবাণুর বিরুদ্ধে সর্বোত্তম সুরক্ষাগুলির মধ্যে একটি কার্যকর করি: হাত ধোয়া।
উদাহরণস্বরূপ, গ্লোবাল হাইজিন কাউন্সিল সুপারিশ করে যে আমরা দিনে ছয়বার হাত ধোয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলে: "সুতরাং ক্ষতিকারক জীবাণুর সংক্রমণ এড়াতে হাতের পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।" যখন হাত ধোয়ার কথা আসে, তখন মুসলমানরাও সবচেয়ে ঘন ঘন হাত ধোয়ার কাজ করে। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য ওযুর সময় এবং বাথরুম ব্যবহার করার পর।

অধিকন্তু, মুসলমানদেরকে শুধু খাবারের আগে নয়, খাবারের পরেও হাত ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন হাদিসে আছে- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তার ঘরের কল্যাণ বাড়িয়ে দিন, সে যেন অজু করে (হাত ধোয়া) যখন তার কাছে সকালের নাস্তা আনা হয় এবং যখন তা তুলে নেওয়া হয়।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়)

আপনি যদি দিনে তিনবার খান তবে এটি ইতিমধ্যে ছয়বার হাত ধোয়া। যদিও অন্যান্য কারণ প্রচুর, এটি নিয়মিত ওযুর একটি সম্পর্কিত বাস্তব-জগতের কাজ। নবী মুহাম্মাদ

(সাঃ) এর জীবন থেকে আমরা একটি জিনিস শিখেছি তা হল তার তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়ার রীতি এবং দুপুরে খাবারের পর কায়লুলা করার অভ্যাস। [সহীহ আল-বুখারি]

বিজ্ঞান আমাদের উপদেশ দেয় যে, রাতে বা দিনে ঘুমানো সমস্যা সমাধানের সুবিধা দেয় ২০০৪ সালে, ইউনিভার্সিটি অফ লুবেক মনোবিজ্ঞানী উলরিচ ওয়াগনার অংশগ্রহণকারীদের দুটি গ্রুপকে সমাধান করার জন্য একটি জটিল বিষয় দিয়েছেন। যে গোষ্ঠীটিকে সন্ধ্যায় শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং রাতে ভাল ঘুমের পরে পরের দিন সকালে শেষ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ২৩% যাদের মধ্যে কোনও বিরতি ছাড়াই সকালে কাজটি শেষ করতে হয়েছিল। তাদের তুলনায় সমস্যাটি সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল।[19]

[19] *মুল: PROF. BRAINY ॥ অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার বজলুর রহমান*
https://dawatulislam24.com/?menu=NewsDetail&menuName=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8&Detail=4976

৬.৪। মুসলমানরা কেন মসজিদে হেঁটে যায়

২০১৪ সালে, স্ট্যানফোর্ডের গবেষক, মেরিলি ওপেজো দেখান যে যারা থ্রেডমিলে হাঁটেন তারা বসে থাকা লোকদের তুলনায় তাদের সৃজনশীলতা ৬০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে। মার্ক জুকারবার্গ এবং স্টিভ জবসের মতো সৃজনশীল মন বিরতির সময় হাঁটার জন্য পরিচিত, লিখেছেন রিচার্ড ওয়াইজম্যান, "শুট ফর দ্য মুন" এর লেখক। মুসলমানদেরও তাদের কাজ থেকে অল্প বিরতি নেওয়ার এবং দিনে পাঁচবার মসজিদে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। অনেক হাদিস অনুসারে শুক্রবারে দীর্ঘ হাঁটা বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়।

কিন্তু মুসলমানদের একটি দল এই সুবিধা ব্যবহার করে না। আওস বিন আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, গোসল করে, তাড়াতাড়ি যায়, তাড়াতাড়ি আসে, কাছে যায়, শোনে এবং নীরব থাকে, তার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে তার জন্য ব্যবস্থা থাকবে। এক বছরের রোজা ও ইবাদতের সওয়াব।

৬.৫। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ে গুরুত্ব

বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য জৈবিক চাহিদার পূরণের পাশাপাশি হল বংশবৃদ্ধি। নারী-পুরুষ আকর্ষণের জৈবিক মডেলকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি ড্রাইভ অর্থাৎ তাড়না হিসাবে মনে করা হয় যা ক্ষুধা বা তৃষ্ণার মতো। আকর্ষণের জৈবিক কারণ হিসাবে নিউরাল সার্কিটগুলি, নিউরোট্রান্সমিটার সব সময় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

কামনা হল যৌন বাসনার প্রাথমিক ধাপ যা অক্সিটোসিন, টেস্টোস্টেরন এবং এস্ট্রোজেনের মতো হরমোন নিয়ন্ত্রন করে। এর প্রভাব কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়, আকর্ষণ আরও ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং রোমান্টিক হয় একটি নির্দিষ্ট সঙ্গীর জন্য, যার মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র লালসা বিকশিত হয়। স্নায়ুবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানুষ মূলত প্রেমে পড়ে যখন তার মস্তিষ্ক নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট সেটের রাসায়নিক পদার্থ ত্যাগ করে। উদাহরণস্বরূপ, নিউরোট্রান্সমিটার হরমোন, ডোপামিন, নরএপিনেফ্রাইন, এবং সেরোটোনিন এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া অ্যাম্ফেটামাইন একই ধরনের পদার্থ যার ফলে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় অংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে, হার্টের কম্পনের হার বৃদ্ধি পায় , ক্ষুধা এবং ঘুম হ্রাস পায়, এবং উত্তেজনা বেড়ে যায় । গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই পর্যায় সাধারণত দেড় থেকে তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

যেহেতু কামনা এবং আকর্ষণ এর পর্যায়গুলিকে অস্থায়ী বলে মনে করা হয়, তাই দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের জন্য একটি তৃতীয় পর্যায় প্রয়োজন। সংযুক্তি হল এক ধরনের বন্ধন যার কারণে সম্পর্ক অনেক বছর এমনকি কয়েক দশক পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সংযুক্তি সাধারণভাবে বিবাহ বা শিশু জন্মদান করার মত অঙ্গীকারগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাছাড়া পারস্পরিক বন্ধুত্ব বা পছন্দের বিষয়গুলি ভাগ করে নেয়ার কারণেও সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে স্বল্পমেয়াদী সম্পর্কের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্র বেশি পরিমাণে রাসায়নিক অক্সিটোসিন এবং ভেসোপ্রেসিন নির্গত হয়। বিজ্ঞানী এনজো ইমানুয়েল এবং তার সহকর্মীরা নির্ধারণ করেন যে প্রোস্টেট গ্রন্থি স্নায়ু

বৃদ্ধিকারক ফ্যাক্টর (এনজিএফ) নিঃসরণ করে, যখন মানুষ প্রথম প্রেমে পড়ে তখন এর মাত্রা অনেক বেশি থাকে, কিন্তু এক বছর পর তারা আবার পূর্ববর্তী স্তরে ফিরে আসে।[20]

[20] https://bn.quora.com/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF

৬.৬। নারী ও পুরুষের শরীরে স্ট্রেসের ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

ইসলামে নারী এবং পুরুষে দায়িত্ব আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। একজন পুরুষ পুরো পরিবারের জন্য জীবিকানির্বাহের দায়িত্ব ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত। যা নারীর জন্য অবশ্যক নয়। বৈজ্ঞানিক মতে নারী ও পুরুষের শারীরিক ও মানসিক কি কি পার্থক্য আছে?

আমাদের দেহে কিছু কেমিক্যাল আছে। এদেরকে হরমোন বলে। এগুলোকে অনেক নামে ডাকা হয়। কখনও বলা হয় 'রাসায়নিক ডাকপিয়ন' (chemical messenger), কখনও 'প্রাকৃতিক ওষুধ'(natural drug)। এরা আমাদের দেহেই এক অঙ্গে উৎপন্ন হয়ে সারা শরীরে কিংবা দূরের কোনো টার্গেট অঙ্গের উপর কাজ করে।

স্ট্রেস> কর্টিসল

কর্টিসলকে বলা হয় 'স্ট্রেস হরমোন'। যতক্ষণ দেহে 'জরুরি অবস্থা' চলে, ততক্ষণ সে বেশি বেশি নির্গত হয়ে জরুরি অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো সমাধা করে। অল্প সময়ের জন্য এদের ত্বরিৎ ভূমিকা তো বুঝা গেল। বিপদ বুঝে হয় বিপদকে আক্রমণ করো, নইলে পালাও (fight-or-flight)। এরপর নিরাপদ চারিপাশ বুঝে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে সব (usually self-limiting)। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সবসময়ই দেহ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে রেখেছে। তখন দেহ সবসময়ই সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকবে। দশ নং মহাবিপদ সংকেত। দেহের কর্টিসল লেভেলও থাকবে হাই। (stressors are always present and you constantly feel under attack, that fight-or-flight reaction stays turned on). তখন আপনার কেমন লাগবে?

মানসিকভাবে একটা পলায়ন-মূলক বা আক্রমণাত্মক একটা অবস্থায় আপনি থাকবেন। কর্টিসল এই অবস্থাটা চালু করে রাখবে। (long-term activation of the stress-response system and the overexposure to cortisol) যদিও এটা দেহের একটা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা, কিন্তু এটাই কাল হয়ে দাঁড়াবে। সতর্ক অবস্থার লক্ষণ হিসেবে অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা বা ভয় ভয়, আত্মবিশ্বাসের অভাব, দ্রুত চিন্তার

পরিবর্তন, মনঃসংযোগে সমস্যা, লাগাতার দুশ্চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা দেখা দেবে। এবং আক্রমণাত্মক অবস্থার লক্ষণ থেকে খিটখিটে মেজাজ আপনি অনুভব করবেন। এগুলো আপনি সবসময়ই অনুভব করতে থাকবেন। দেহে যেহেতু রেড এলার্ট চলছে তাই আপনার ঘুম আসবে না, ঘুমের অভাবে ঝিমুনি আসবে, ঘুমের অভাবে মাথাব্যথা করবে, ক্লান্তি লাগবে। জরুরি প্রয়োজনে মাসলও এলার্ট থাকে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ টানটান উত্তেজিত থাকায় এখন মাসলে ব্যথা করতে থাকবে। পলায়ন-মূলক ঐ মানসের কারণে নিজেকে গুটিয়ে নেবেন আপনি।

ওদিকে কর্টিসলের কারণে আপনার দেহের ভিতরে কী হচ্ছে? অল্প সময়ের জন্য যখন বের হয়েছিল তখন উপকারই করেছিল। কিন্তু এখন ক্ষতি হতে থাকবে। তখন হার্টবিট বাড়িয়েছিল পেশীতে সাপ্লাইয়ের জন্য। কিন্তু এখন সবসময়ই আপনার বুক ধড়ফড় করতে থাকবে। তখন হার্টের পাম্পিং চাপটা বাড়িয়েছিল কাজের জন্য। আর এখন বেড়েই থাকবে, আপনার রক্তচাপ হাই করে রাখবে। তখন রক্তে গ্লুকোজ বাড়িয়েছিল পেশীর দরকার হবে বলে, দেহ ভাবছে এখনও দরকার। কিন্তু দরকার না থাকা সত্ত্বেও সে আপনার রক্তে গ্লুকোজ হাই করে রাখবে, যাকে সোজা বাংলায় ডায়বেটিস বলে। আপনার দেহের সব ধরনের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কমিয়ে রাখবে, গ্লুকোজের আধিক্য যেকোন ইনফেকশানকে সারতে দেবে না সহজে। তারপর আপনার চর্বি থেকে ফ্যাটকে ভেঙে রক্তে ছড়িয়ে দেবে, যেটা গিয়ে জমা হবে রক্তনালীর গায়ে, সেখান থেকে হার্টে ব্লক হিসেবে জমা হতে থাকবে। জরুরি অবস্থা মনে করে আপনার বিপি উপরে তুলে রাখবে, প্রেসারের রোগী। মোদ্দাকথা শরীর-মন সবই শেষ করে দিতে থাকবে স্ট্রেস একটু একটু করে। আর যত দোষ, কর্টিসল ঘোষ।

স্ট্রেস> কর্টিসল> নারী

স্ট্রেস অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক চাপের ভিতর পুরুষ ও নারীর দেহ আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া দেখায়। স্বাভাবিকভাবে (resting) পুরুষের চেয়ে নারীদের রক্তে কর্টিসল লেভেল এমনিতেই একটু বেশি থাকে। সমস্যাটা হল, একই ধরনের স্ট্রেসে পুরুষের চেয়ে নারীর দেহে বেশি কর্টিসল নির্গত হয়। Obminski দেখিয়েছেন, একটা কম্পিটিশানের আগেই নারীদের গড় কর্টিসল লেভেল (লালায়) পুরুষের চেয়ে বেশি ছিল।

কম্পিটিশানের পর উভয়েরই বেড়েছে, নারীদের বেড়েছে অনেক বেশি। অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক স্ট্রেস নারীতে প্রভাব বেশি ফেলে পুরুষের চেয়ে বেশি।

US Office on Women's Health জানাচ্ছে, স্ট্রেসের লক্ষণগুলো মহিলাদের বেশি প্রকাশ পায়। Industrial Psychiatry Journal এ প্রকাশিত ভারতীয় মনোচিকিৎসকদের এক রিসার্চের [5] বরাতে তারা লিখেছে, স্ট্রেসে থাকা পুরুষের চেয়ে স্ট্রেসে থাকা নারীদের ডিপ্রেশান ও অ্যাংজাইটি বেশি হয়। দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেস বিশেষ করে নারীদের মানসিক সমস্যা তৈরি করে। নারীদেহে যে সমস্যাগুলো হয় লম্বা স্ট্রেসের কারণে সরকারি এই অফিস জানাচ্ছে:

- মাথাব্যথা ও মাইগ্রেন: টেনশন থেকে মাথাব্যথা (Tension Type Headache) অসুখটা নারীদের বেশি হয়।

- ডিপ্রেশান ও উদ্বেগ: বিগত বছরগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারীতে ডিপ্রেশানের ঘটনা দ্বিগুণ। Post-Traumatic Stress Disorder, Panic Disorder বা Obsessive-Compulsive Disorder এর মত মানসিক রোগগুলো নারীদের বেশি হয়। রিসার্চ জানাচ্ছে, পুরুষের চেয়ে নারীরা স্ট্রেসের লক্ষণগুলোতে বেশি ভোগেন বা লক্ষণ বেশি প্রকাশ পায়। দীর্ঘদিনে ব্যাপারটা এসব বড় বড় সমস্যার দিকে গড়ায়।

- হৃদরোগ: স্ট্রেসের কারণে হার্টকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কাজ করতে হয়। উচ্চ রক্তচাপ থেকে হার্টের সমস্যা ও ব্রেইন স্ট্রোকের সমস্যা হতে পারে। বিশেষত কমবয়েসী নারীদের হার্টের সমস্যাগুলো মূলত হার্টের উপর এই স্ট্রেসের কারণেই হয়।

- বদহজম: অল্প স্ট্রেসের কারণে ডায়রিয়া-বমি হতে পারে। কিন্তু লম্বা সময় নিয়ে স্ট্রেস থেকে Irritable Bowel Syndrome (IBS) নামক অসুখ হতে পারে। পুরুষের চেয়ে নারীদের এই রোগের হার দ্বিগুণ।

- মুটিয়ে যাওয়া: স্ট্রেসের কারণে মুটিয়ে যাবার সম্ভাবনা নারীদের অনেক বেশি পুরুষের চেয়ে। কারণটা হল বেশি কর্টিসল নির্গত হওয়া।

- গর্ভধারণে সমস্যা: স্ট্রেসে থাকা নারীদের গর্ভধারণে নানান সমস্যা দেখা দেয়। কমপক্ষে এটা হয় যে, আপনি যখন চাচ্ছেন তখন কনসিভ করতে পারছেন না।

- পিরিয়ডে সমস্যা: ক্রনিক স্ট্রেস মহিলাদের PMS এর সমস্যা বেশ হয়, মারাত্মক পর্যায়ের হয়।

- যৌন আগ্রহ কমে যাওয়া: স্ট্রেসের কারণে নারীর উত্তেজিত হতে সময় লাগে বেশি। এছাড়া এক রিসার্চে এসেছে, মিলনকালে স্ট্রেসে থাকা নারীরা ফোকাস করতে পারে না। ফলে অর্গাজমের অভাবে যৌনজীবনে অসুখী হয়।

দেখেন, স্ট্রেসের কারণে যে অসুখগুলো হয়, সেগুলো সব কিন্তু নারীদেরই বেশি হয় পুরুষের চেয়ে। এটাই প্রমাণ করে স্ট্রেসের কারণে নারী ভোগে পুরুষের চেয়ে বেশি। একই মাত্রার স্ট্রেসে নারী বেশি কাতর। যদিও 'নারীরা বেশি স্ট্রেস নিতে পারে' জাতীয় রিসার্চের অভাব নেই। এসব বকওয়াস রিসার্চ কোনো ডাক্তারকে গেলাতে পারবেন না। কেননা উপরেরগুলো ছাড়াও আমরা রুগী হিসেবে যে Fibromyalgia বা HCR এর কেসগুলো পাই সেগুলোর ৯৫%-ই নারী, এই রোগগুলো কেবলমাত্র স্ট্রেস থেকেই হয়। সুতরাং নারীবাদের দাবিগুলোর সপক্ষে রিসার্চের আধিক্য ও প্রচার আমাদের ওয়াশ করতে যথেষ্ট না। কেবল এখানেই শেষ না, Dr. Irwin Goldstein, M.D. এর মতে হাই কর্টিসল লেভেল দেহের স্বাভাবিক সেক্স-হরমোনগুলোকে দমন করে নানান সমস্যা তৈরি করে ফেলে:
- অনিয়মিত পিরিয়ড, পিরিয়ডের সময়কাল কমে যায় ৫০%
- ব্রনের আধিক্য: এক রিসার্চে এসেছে, কলেজ ছাত্রীদের বেশি ব্রন হয় পরীক্ষার সময়ে
- চুল পড়া
- অধিক গ্যাস্ট্রিক এসিড তৈরির কারণে আলসার জাতীয় সমস্যা
- ডিপ্রেশান
- নিদ্রাহীনতা
- মুটিয়ে যাওয়া, কর্টিসল ক্ষুধা বাড়ায়
- বন্ধ্যাত্ব: কর্টিসল আরেকটা রস বাড়ায় যার নাম 'a-এমাইলেজ'। যার এই রস বেশি, তার সন্তান ধারণের সম্ভাবনা ১২% কম
- হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক: ২০১২ সালে ২২,০০০ নারীর উপর এক রিসার্চে এসেছে, যেসব নারীদের চাকুরি-কেন্দ্রিক স্ট্রেস (job-related stress) বেশি, তাদের ৪০% বেশি সম্ভাবনা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক (cardiovascular event) হবার।

স্ট্রেস নারীদেহে প্রস্রাব ও যোনিপথের ইনফেকশান (genitourinary tract infections) বাড়ায়। কর্টিসল যোনিপথে অবস্থানরত উপকারী ব্যাকটেরিয়া কলোনী ধ্বংস করে দেয়। ফলে অপকারী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইনফেকশান বাড়ে।

নারী < **কর্টিসল** < **স্ট্রেস** < **জব**

স্ট্রেস নারীতে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। নারীদেহ উপযোগী নয় অধিক স্ট্রেস নেবার। কিন্তু কেন হয় এই স্ট্রেস? বিপদ সন্দেহে স্ট্রেস হয়। যখন আপনার মনে হবে আপনার হাতে কিছু নেই, নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আপনার জীবনে যা যা হচ্ছে কিছুই আপনার কন্ট্রোলে নেই, আপনি যা চাচ্ছেন তা হচ্ছে না। এই হতাশা, তিতকুটে মন, রাগ, প্রতিকূলতার অনুভূতিকে আমাদের ব্রেন বিপদ হিসেবে বুঝে নেয় এবং ১৪৪ ধারা জারি করে এসব ঘটায়।

সেটা হতে পারে চাকরিতে — বেকারত্ব, বিরাট কাজের চাপ, রিটায়ারমেন্ট।

কিংবা পরিবারে — ডিভোর্স, সম্পর্কে অবনতি, ঝগড়াঝাটি।

হতে পারে ব্যক্তিগত কারণে — জটিল রোগ, কারও শোক, আর্থিক সমস্যা।

শুধু তাই না। প্রতিদিন আপনাকে নানান হ্যাপা সামলাতে হয়। যেমন কাজের প্রেসার, বিলটিল দেয়ার জন্য লাইনে খাড়ানো, পরিবারের একগাদা বাজার-সদাই। দেহ এইসব ছোটখাট চ্যালেঞ্জকেও 'থ্রেট' হিসেবে নেয়, ফলে দেহ সবসময় একটা 'সারভাইভাল মোড' এ থাকে (you may feel as if you're constantly under attack)।

আর এই কর্মক্ষেত্রই নারীর জন্য সেই বাড়তি স্ট্রেস। যেটা নারী আগে নিত না, আপনারা নেয়াচ্ছেন, নিতে উৎসাহিত করছেন, সামাজিক মর্যাদার নামে। এখন কর্মক্ষেত্র সামলে নারীকে ঘরও সামলাতে হয়। মায়ের কাজ কখনোই বাবা কিংবা বুয়া দিয়ে হবে না। কেন হবে না সে বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এঁড়ে তর্ক চলতে পারে। সামনে শিশুর সাথে মায়ের সম্পর্ক যে কোনোভাবেই ইন্টারচেঞ্জাবল না সেটা প্রমাণ করে দেয়া হবে। তো যা বলছিলাম আপনি জোর করে ৯টা-৫টা অফিস করাতে পারেন। আমাদের মেয়েরা জোর করে তা করতেও পারে মুখে মেকি হাসি ধরে রেখে। কিন্তু দেহকে মানাবেন কি দিয়ে? পুরুষের সমান হবার মূলো দিয়ে নারীর মুখ বন্ধ করলেন, এবার কর্টিসল বন্ধ করবেন

কীভাবে? আসুন দেখি, এসি রুমে চাকরি করা নারীদের ভবিষ্যতটা দেখি। তাহলে রোদে ঘেমে-নেয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে চাকরি করা নারীদের অবস্থাটাও বুঝে এসে যাবে।

পুরুষপ্রধান কর্মস্থলে কর্মরত নারীরা আরও উচ্চমাত্রার উদ্বেগের মাঝে থাকে (high levels of interpersonal stress) যা তাদের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে। American Sociological Association-এর বার্ষিক মিটিঙের এক প্রেজেন্টেশানে তাই উঠে এসেছে। Indiana University Bloomington-এর গবেষকরা ৪৪০ জন নারীর দৈনিক স্ট্রেস হরমোনের প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করেছেন। এসব নারীরা এমন অফিসে কাজ করেন যেখানে ৮৫% সহকর্মী পুরুষ। এবং কর্মস্থলে সবসময়ই পুরুষকে বেশি রাখা হবে, কেন তা সামনে আলোচনায় আসছে। কেন নারী-পুরুষ সম সুযোগের কথা বলে বলে পুরুষকেই এগিয়ে রাখা হবে এবং হচ্ছে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে, সেটা সামনে আসছে। মানে নারীর কর্মস্থল পুরুষপ্রধানই থাকবে।

পুরুষ-প্রধান চাকরিগুলোতে কিছুটা আলাদা থাকা, যৌন নিগ্রহ এবং কম সাপোর্ট পাওয়ায় নারীরা প্রায়শই স্ট্রেসের মাঝে থাকেন। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল সারাদিন উঠানামা করলেও, যারা উচ্চ মাত্রার স্ট্রেসে টানা সারাদিন থাকে তাদের ক্ষেত্রে একটা এলোমেলো অবস্থায় চলে যায়। ফলে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় কর্টিসল লেভেলটা এইসব নারী কর্মজীবীদের। Sociology and gender studies-র Assistant Professor Cate Taylor বলেন, কিন্তু একই পরিবেশে পুরুষদের ক্ষেত্রে নারীদের মত অনিয়ন্ত্রিত কর্টিসল পাওয়া যায় না। তিনি জানান, এই কর্টিসল যতটা না শারীরিক স্ট্রেসের সাথে সম্পর্কিত, তার চেয়ে বেশি মানসিক বা সামাজিক স্ট্রেস-এর সাথে বেশি সম্পর্কিত। তাই নারীদের এই এই অনিয়ন্ত্রিত কর্টিসল লেভেলের জন্য কিছুটা হলেও নেগেটিভ কর্মপরিবেশ দায়ী।

একে তো নারীদেহে কর্টিসল একটু বেশি। অধিক কর্টিসলে তারা কাতর হয় বেশি। এর উপর আবার জব-রিলেটেড স্ট্রেসটুকু তাদের উপর 'আগুনে ঘি ঢালা'। হয়ত অনেকে বলতে পারেন, পরিবাশটা নারীবান্ধব করলেই তো হল। আমার প্রশ্ন, যদি নারীবান্ধবই করার দরকার হয়, তবে জেন্ডার ইক্যুয়াল বলছেন কেন? পুরুষবান্ধব তো করার দরকার

হয়নি? জেন্ডার যদি সমানই হয়, তবে এই ‘বান্ধব’ করার কি দরকার? হ্যাঁ দরকার হচ্ছে, কারণ পুরুষের দায়িত্ব যখন নারী নিচ্ছে, তখন নারীর জন্য আলাদা পরিবেশ করে দিতে হচ্ছে। যে পরিবেশে পুরুষ কাজ করে এসেছে এতকাল, সেই পরিবেশ নারীর জন্য না বলেই নারীর সমস্যা হচ্ছে।

Forbes–এর গ্লোবাল হেলথ সার্ভিস কোম্পানি Cigna তাদের ৫ম বার্ষিক জরিপে (5th annual survey of wellbeing) আমেরিকা, সৌদি, নিউজিল্যান্ড, ভারত, কানাডা ও তুরস্কের ১৩ হাজার লোকের উপর স্টাডি করে। তাদের জরিপে উঠে আসে:

- ৮৪% মানুষ কর্মক্ষেত্রে স্ট্রেসে আছেন
- ১৩% এর অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে
- ব্রিটেনে ৭৯% নারী কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেসে ভুগছেন, ৬৬% পুরুষ। নারীদের স্ট্রেসের প্রধান কারণ ৩ টি: কাজের লোড, নিজের স্বাস্থ্য ও আর্থিক ব্যাপারস্যাপার।
- ৭৮% নারী কর্মজীবীর ঘুমে সমস্যা, ৬৬% পুরুষের।
- মোটের উপর ৮৭% নারী চাকুরি নিয়ে স্ট্রেসে আছেন বলে জানিয়েছেন।
- ৬৪% বলছেন তাদের ২৪ ঘণ্টাই অফিস করতে হচ্ছে স্মার্টফোনের কল্যাণে।

Harvard Business Review জানাচ্ছে, বর্তমানে সুপার-চার্জড কর্মক্ষেত্রে সবাই স্ট্রেসে আছে, কিন্তু পুরুষের চেয়ে নারী কর্মকর্তারা বেশি স্ট্রেস, উদ্বেগ ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন [18] (Yet executive and professional women consistently experience more stress, anxiety, and psychological distress than do men)

গার্ডিয়ান জানিয়েছে ২৫-৫৪ বছর বয়েসী নারীরা কর্মক্ষেত্রে বেশি স্ট্রেসে থাকেন তাদের পুরুষ কলিগদের তুলনায়। লন্ডনের Priory’s Wellbeing Centre-এর মনঃচিকিৎসক Dr Judith Mohring নারীর স্ট্রেসের কারণ হিসেবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন [19]:-

- নিজেকে পুরুষের সমান প্রমাণ করা
- মূল্যায়ন না হওয়া

- কম বেতন

- 'মানিয়ে নেবার' প্রত্যাশার চাপ

- অফিসে পুরুষ আধিক্য

- অফিস ও পরিবারের মাঝে ব্যালেন্স করা।

ভারতে হায়দরাবাদের একটি আইটি ফার্মের ২০০ কর্মীর উপর গবেষণা করে গবেষকগণ বলেন, নারীর এই দ্বৈত ভূমিকাই তাদের কর্মস্থলে পুরুষের চেয়ে বেশি স্ট্রেস অনুভব করার মূল কারণ।

এখনো কিন্তু আমরা নারীর দৈহিক পরিশ্রমের কথা বলিইনি। এক্সিকিউটিভ লেভেলে এসি রুমে কথাবার্তা চলছে। এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি বাইরে, দেখেন আপনারা কী করেছেন মানব সভ্যতার। হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান।

স্ট্রেস> **কর্টিসল**> **নারী**> **বন্ধ্যাত্ব**

একটা স্ট্রেসের পরিবেশে যতটুকু কর্টিসলে পুরুষের কিছুই হয় না, সেটুকুতেই নারী শরীর বেঁকে বসে। আপনারা সেসব পরিবেশেও নারীকে ঠেলে দিয়েছেন। আমরা আগেই জেনে এসেছি, শারীরিক পরিশ্রমও একটা স্ট্রেস। লম্বা সময়ের স্ট্রেসে আমাদের HPA axis (হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারি-অ্যাড্রেনাল) এক্টিভেট হয়। লাস্টলি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে ৩ ধরনের হরমোন বের হয়ে রক্তে মেশে।

- মিনারেলোকর্টিকয়েড গ্রুপ: রক্তে পানি ধরে রেখে রক্তের চাপ বাড়ায়

- গ্লুকোকর্টিকয়েড গ্রুপ: যার মধ্যে একটা কর্টিসল। আরেকটা কর্টিকোস্টেরোন। এরা গ্লুকোজ সাপ্লাই বাড়ায়।

- অ্যাড্রোজেন গ্রুপ: গ্রীক শব্দ Andros মানে পুরুষ, আর genesis থেকে gen, মানে তৈরি করা। পুরুষতৈরিকারী হরমোন এটা। পুরুষের মূল হরমোন টেস্টোস্টেরন যেটা আসে টেসটিস থেকে। আর এগুলো হল সহযোগী (কিছু testosterone এবং androstenedione, dehydroepiandrosterone)। যেসব নারীর লোম বড়

বড়, হালকা গোঁফের রেখা, বা বেশি ব্রন হয়, তাদের এই অ্যান্ড্রোজেন গ্রুপ বেশি থাকে। মানে পুরুষের কিছু বৈশিষ্ট্য তৈরি করে এরা।
যত বেশি আপনি শরীরের কসরত করবেন, তত আপনি মাস্কিউলার হতে থাকবেন, পেশীবহুল হবেন। কারণ আপনার দেহ আপনার শারীরিক শ্রমকে স্ট্রেস হিসেবে দেখে। ফলে অন্য সব হরমোনের মত অ্যান্ড্রোজেনও নির্গত হতে থাকে, কর্টিসলের সাথে। নারীদেহে পড়ে বিরূপ প্রভাব। নারী অ্যাথলেটদের এই অধিক দৈহিক পরিশ্রম নানান রোগের জন্ম দেয়, যেমন ধরেন বয়ঃসন্ধি দেরিতে আসা, মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা হাড়ক্ষয়।

Current Anthropology journal বলছে, অধিক শারীরিক শ্রম নারীকে বন্ধ্যা করে ফেলে। সে কী? কেন? University of Utah-এর নৃতাত্ত্বিক Professor Elizabeth Cashdan এর মতে ২০-৩০ বছর বয়েসী নারীরা যারা 'শ্রমসাধ্য ক্যারিয়ার' করছেন, অধিক পরিশ্রম ও নিজেকে অতিরিক্ত স্ট্রেসের সম্মুখীন করার দ্বারা সন্তানধারণের সম্ভাবনা কমিয়ে ফেলছেন। তিনি বলেন, উচ্চমাত্রায় স্ট্রেসের কারণে হরমোনের পরিবর্তন আসে। নারী হরমোনটা (ইস্ট্রোজেন) কমতে থাকে, যেটা গর্ভধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বরং আরও যে কাহিনীটা হয়, নৃতাত্ত্বিক মাপকাঠিতে নারীসুলভ দৈহিক গড়ন হারিয়ে যেতে থাকে, নারীসুলভ বাঁকা দৈহিক গঠন আর থাকে না যেটা গর্ভধারণের জন্য দরকার ছিল। কারণটা হল, কায়িক পরিশ্রমের দরুণ রক্তে পুরুষ হরমোন (অ্যান্ড্রোজেন) বেড়ে যাওয়া। টাইম ম্যাগাজিন বলছে, প্রোফেসর কাশদানের এই রিসার্চকে বেশ সিরিয়াসলি দেখছেন বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞরা।

আমেরিকান আর্মিতে নারী সৈন্যরা ৩ গুণ বেশি বন্ধ্যাত্বে ভুগছে সিভিলিয়ান নারীদের চেয়ে। উত্তর কোরিয়ার সব মেয়েদের ৭ বছর আর্মিতে বাধ্যতামূলক কনস্ক্রিপশান সার্ভিস দিতে হয়। সাবেক নারীসেনা Lee So Yeon জানাচ্ছেন BBCকে, ৬ মাস থেকে এক বছর সার্ভিস দেবার পর আমাদের মাসিক-ই বন্ধ হয়ে যেত। ২০ বছর বয়েসী এক মেয়ের বন্ধ ছিল টানা ২ বছর। Obstetrics and Gynecology-র Clinical Assistant Professor Dr. Robert Berg বলছেন নিউজউইক-কে, এটা মূলত কঠোর শারীরিক

শ্রম, স্ট্রেস ও অপুষ্টির কারণে হয়েছে, যাকে আমরা বলি functional hypothalamic amenorrhea. এবং এটা সাধারণত স্ট্রেস সরে গেলে আবার ঠিক হয়ে যায়।

Journal Occupational and Environmental Medicine-এ প্রকাশিত এক রিসার্চে এসেছে, সন্ধ্যায় বা রাতে (antisocial hours) চাকরি করা বা শিফটিং ডিউটি (rotating shifts) করার প্রভাব পড়ে নারীর গর্ভধারণে। যদিও এর কারণ জানা যায়নি, তবে Harvard T.H. Chan School of Public Health-এর গবেষকেরা মনে করেন, সন্তানধারণে ইচ্ছুক নারীদের বিষয়টা নিয়ে ভাবা উচিত। এই গবেষণাটিতে তাঁরা সরাসরি গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মাপকাঠিগুলো (direct biomarkers for fertility) নিয়ে কাজ করেছেন, যেমন— পরিণত ও অপরিণত ডিম্বাণুর সংখ্যা বা হরমোন লেভেল (FSH ও ইস্ট্রোজেন) । বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা নিতে আসা ৪৭০ জন নারীর উপর রিসার্চ করে পাওয়া গেছে, যত ভারি কাজ করেছে বা মালামাল সরানো জাতীয় কাজ করেছে, তত অপরিণত ও পরিণত ডিম্বাণুর সংখ্যা কমে গেছে। নর্মালের চেয়ে মোট ডিম্বাণু ৮.৮% কম। আর পরিণত ডিম্বাণু কমে গেছে ১৪.১%। রোগতত্ত্ববিদ Audrey Gaskins জানিয়েছেন CNN-কে, একই ফলাফল আমরা আলাদা আরেকটা গবেষণায়ও পেয়েছি।

অনুসংহার

পুরুষের শারীরতত্ত্ব স্ট্রেস নেবার জন্যই- তৈরি হয়েছে বা বিবর্তিত হয়েছে, যেটাই বলেন। নারীর শরীর বিশেষভাবে প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সৃষ্ট কিংবা বিবর্তিত হয়েছে। এই সহজ সত্যটা অস্বীকার করে সমতার গলার জোরে মানবসভ্যতার কী হাল করে ছাড়ছেন! ৭০-৮০% নারী দাঁতে দাঁত চেপে আপনাদের সমতার বয়ানের উপর আমল করে চলেছে। সমতার নামে নারীদের আমরা ঠেলে দিয়েছি অনাবশ্যক স্ট্রেসের দিকে, ধূমপানের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এই স্লো-পয়জনিং। তিলে তিলে আমাদের নারীরা নিজেদের শেষ করছে। আত্মতুষ্টি, সমাজের নিজের অবস্থান জানানো, স্বামীর নির্যাতন

থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চাকুরিমুখীতা? এছাড়া আর উপায় কি ছিল না? কোনোকালেই?

ইতিহাসে সব সভ্যতায় সব সংস্কৃতিতে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে, এটা অকাট্য সত্য। এবং নারীবাদের জন্মটা বৈধ, এই ঐতিহাসিক নির্যাতন থেকে নারীর মুক্তির জন্যই। ইউরোপীয় নারীসমাজের জন্য এ ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু কালক্রমে নারীবাদ যৌবনে এসে পুঁজিবাদের রক্ষিতার ভূমিকা পালন করছে। অর্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই নষ্ট পুঁজিবাদী সমাজে অর্থ উপার্জনকেই নারীরা মুক্তির উপায় হিসেবে নিয়েছেন। অর্থের অংকে মাপা জিডিপি-তে নিজেদের আর্থিক অবদানকেই খুঁজে মরছেন। কিন্তু কেবল অর্থ ছাড়াও সমাজে দাম পাওয়া যায়, নিজেকে যোগ্য ও সৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারাও যে সমাজের শ্রদ্ধার পাত্রী হওয়া যায়। সেটা ১৪০০ বছর আগে মরুর নারীরা দেখিয়ে গেছে কিছু সময়ের জন্য। সেই শিক্ষায় রিএডুকেট করেও নারীর সম্মান ফিরিয়ে আনা যেত। সেটা পশ্চিমা সভ্যতা না বুঝতে পারে, কিন্তু মুসলিম নারীরাও বুঝতে চাচ্ছে না! পশ্চিমের সামাজিক ফর্মুলাগুলোকেও ধ্রুবক ধরে নিয়ে তাদের নারী সূচক, তাদের করে দেয়া নারী নীতি, তাদের চাপিয়ে দেয়া নারীমুক্তির ফরম্যাটই কেন মানতে হবে আমাদের। ব্রিটিশ নারীর মুক্তি আর বাংলাদেশের নারীর মুক্তি একই সূত্রে কেন সমাধান করতে হবে? তাদের সমস্যা আর আমাদের সমস্যা কি এক? তাদের প্রেক্ষাপট আর আমাদের প্রেক্ষাপট কী এক? এই মানসিক দাসত্বের শেষ কোথায়!?[21]

[21] *https://bn.quora.com/baijnanika-mate-nari-o-purusera-saririka-o-manasika-ki-ki-parthakya-ache*

শেষ কথা

কুরআন মানবজাতির জন্য হিদায়াত; মানবজাতির শুরু থেকে একদম কিয়ামত পর্যন্ত। আর বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনের প্রতি বিষয় অনুধাবনের জন্য সুনিপুণ নিরীক্ষণের মাধ্যমে চলেছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবিষ্কার। কুরআন মাজিদে বিভিন্ন আয়াত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির রহস্যকে লুকায়িত রেখেছেন যা বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে চলছে। কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান এখনো অনেক আবিষ্কার বাকী। যত কুরআন নিয়ে গবেষণা করা হবে তত-ই নিত্যনতুন বিষয় বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে মূল্যায়ন সম্ভব নয়, বরং ইসলাম দিয়ে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

তথ্য-উপাত্ত সমূহ

1. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6
2. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE
3. রচনাসমগ্র: ডা. জাকির নায়েক
4. https://dawatulislam24.com/?menu=NewsDetail&menuName=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%20%E0%A6%93%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8&Detail=4976

   মূল: PROF. BRAINY ॥ অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার বজলুর রহমান
5. https://bn.quora.com/%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF
6. https://bn.quora.com/baijnanika-mate-nari-o-purusera-saririka-o-manasika-ki-ki-parthakya-ache